লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্

পাক্ষিক আহ্‌মদী

The Ahmadi Fortnightly
Since 1922

নবপর্যায় ৮৫ বর্ষ | ১২তম সংখ্যা

প্রকাশনার ১০০ বছর

ভালবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারও 'পরে
Love for All
Hatred for None

রেজি. নং: ডি. এ.-১২ | ১৬ পৌষ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ | ০৬ জমা. সানি ১৪৪৪ হিজরি | ৩১ ফাতাহ্ ১৪০১ হি. শা. | ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ ঈসাব্দ

মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত
পাকশী হার্ডিঞ্জ ব্রিজ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, নাটাইয়ে মহান সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা উদ্‌যাপন

সম্পাদকীয়

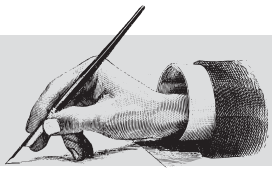

হযরত ঈসা (আ.), মে'রাজ ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট নবী-রসূল এ জগতে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আগমন করেন এবং নিজেদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে মৃত্যুর মাধ্যমে এ জগত থেকে বিদায় নেন। ঠিক একইভাবে হযরত ঈসা (আ.)ও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আগত এক নবী ও রসূল ছিলেন। তিনিও মৃত্যুবরণ করেছেন এবং এ নশ্বর পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। এ যুগে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আগত হাকামান আদালান হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ বিষয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন। তিনি (আ.) বলেন, "আল্লাহ্ সাক্ষী, ঈসা (আ.) মারা গেছেন– কেবল একথা বলার জন্য আমি আগমন করি নি অথবা আমার আগমনের উদ্দেশ্য কেবল এটিই নয়। এ তো এক মহাসত্য যা আমি কেবল উপস্থাপন করেছি। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এবিষয়ে যেভাবে জানিয়েছেন সেভাবেই আমি তা জগতের সামনে উপস্থাপন করেছি। ঈসা (আ.)-এর সাথে আমার কোনো শত্রুতা নেই। তিনিও আল্লাহ্ তা'লার এক নবী ও রসূল। আমার বক্তব্য হল, নশ্বর এই দেহ নিয়ে তিনি আকাশে যান নি। যে বিষয়টি আমি অন্য কোনো নবী ও রসূলের ক্ষেত্রে মানতে পারি না সে বিষয়ে আমি কীভাবে তাকে স্বতন্ত্র ভাবতে পারি? তবে একটি বিষয় (স্বীকার করার ক্ষেত্রে) আমার মাঝে কোনো কার্পণ্য নেই আর তা হল, আমি স্বীকার করি, যে দেহসহ অন্যান্য নবী-রসূল আকাশে গেছেন, হযরত ঈসা (আ.)ও সেই একই দেহ নিয়ে উত্থিত হয়েছেন। অতএব অপরাপরদের ভুল ভাবনা এবং মনগড়া কথাবার্তা আমি কীভাবে গ্রহণ করতে পারি?

খুব ভালভাবে স্মরণ রাখবে, আমি হযরত ঈসা (আ.)-কে আকাশে দেহহীন আত্মা মনে করি না। আমি মনে করি, তিনি সেখানে দৈহিকভাবেই আছেন তবে পার্থক্য কেবল এতটুকু যে, এইসকল লোক বলে তিনি নশ্বর দেহ নিয়ে আছেন পক্ষান্তরে আমি বলি তিনি সেই দেহ নিয়ে আছেন যে দেহ অন্যান্য নবী-রসূলদের দেয়া হয়েছে। দোযখের বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'লা তুফাত্তাহু লাহুম আবওয়াবাস্ সামা' (সূরা আ'রাফ: ৪১) অর্থাৎ কাফেরদের জন্য আকাশের দরজা খোলা হবে না আর মু'মিনদের ক্ষেত্রে বলা আছে, 'মুফাত্তাহাতাল্ লাহুমুল আবওয়াব' (সূরা সাদ: ৫১) [অর্থাৎ তাদের জন্য সদাসর্বদা আকাশের দ্বার খোলা থাকবে]।

এ আয়াতে 'লাহুম' শব্দটি 'আজসাম' নির্দেশ করে, তবে কি সব মু'মিন এই নশ্বর দেহ নিয়ে আকাশে যায়? না, এমনটি আদৌ নয়। একপ্রকার দেহ তো লাভ হয় কিন্তু তা সেই দেহ যা মৃত্যুর পর দান করা হয়। এমনইভাবে 'ফাদখুলী ফী ঈবাদী ওয়াদখুলী জান্নাতী" (সূরা ফজর: ৩০-৩১) [অর্থাৎ অতএব তুমি আমার বান্দাত্বের মাঝে প্রবেশ করো এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ করো] এটিও একপ্রকার দেহ চায়। এরপর তৃতীয় সাক্ষ্য মহানবী (সা.)-এর সেই বিখ্যাত রুইয়া অর্থাৎ মে'রাজ যেখানে তিনি হযরত ঈসা (আ.)-কে হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর সাথে দেখেছিলেন। তিনি (সা.) সেখানে তো আত্মাদের দেখেন নি অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ.) কেবল দেহসহ ছিলেন আর অন্যান্য নবীদের আত্মা ছিল– এমনটি নয়।

সত্য এবং নিশ্চিত সত্য আর পরিষ্কার কথা হল, (মৃত্যুর পর) অবশ্যই একপ্রকার দেহ লাভ হয় কিন্তু নশ্বর এই দেহ জগতেই থেকে যায়, এ নশ্বর দেহ আকাশে যেতে পারে না। যেমন মহানবী (সা.) কাফেরদের কথার উত্তরে বলেছিলেন, 'কুল সুবহানা রাব্বী, হাল কুনতু ইল্লা বাশারান রসূলান' (বনী ইসরাঈল: ৯৪) অর্থাৎ তুমি তাদেরকে বলে দাও, আমার প্রভু পূর্বে যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, নিজ সকল প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা থেকে তিনি পবিত্র, আমি তো কেবল এক মানব রসূল। 'সুবহান' শব্দটি ব্যবহার করার উদ্দেশ্য হল, পূর্বে আল্লাহ্ তা'লা যত প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন, তিনি সেগুলোও ভঙ্গ করেন না। পূর্বের সেই প্রতিশ্রুতি কী ছিল? 'লাকুম ফিল আরযে মুসতাকাররুওঁ ওয়া মাতাউন ইলা হীন' (সূরা বাকারা: ৩৭) [অর্থাৎ আর তোমাদের জন্য পৃথিবীতে অবস্থান এবং কল্যাণপ্রাপ্ত হওয়া একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ] আর এমনইভাবে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'আলাম নাজআলিল আরযা কিফাতা' (মুরসালাত: ২৬)। আর এ-ও বলেছেন, 'ফীহা তাহইয়াওনা ওয়া ফীহা তামূতূন' (সূরা আ'রাফ: ২৬) [অর্থাৎ এই পৃথিবীতে তোমরা জন্মলাভ করে থাক আর এই পৃথিবীতেই তোমাদের মৃত্যু হয়]। অতএব এই সকল আয়াতের প্রতি একযোগে অভিনিবেশ করলে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়, যে দেহ খাদ্য গ্রহণের মুখাপেক্ষী সেই দেহ আকাশে যায় না। সেক্ষেত্রে আমি অন্যান্য নবীদের তুলনায় মসীহ্ (আ.)-কে কীভাবে বিশেষত্ব দেয়া মেনে নিতে পারি?" *(মালফুযাত: অষ্টম খণ্ড, পৃ. ৫৫-৫৬)*

সূচিপত্র

৩১ ডিসেম্বর ২০২২

পবিত্র কুরআন ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃতবাণী ৫

১৫ জুলাই, ২০২২ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডে অবস্থিত মুবারক মসজিদে প্রদত্ত হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর **জুমুআর খুতবা** ৬
বিষয়: ***হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর স্মৃতিচারণ***

২২ জুলাই, ২০২২ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডে অবস্থিত মুবারক মসজিদে প্রদত্ত হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর **জুমুআর খুতবা** ১৫
বিষয়: ***হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর স্মৃতিচারণ***

সীরাতুল মাহদী (আ.) ২৪
[হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনচরিত]
প্রণেতা: হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ. (রা.)
ভাষান্তর: মাওলানা জুবায়ের আহমদ

নেযামে খেলাফতের গুরুত্ব ২৬
মূল: মাহমুদ আহমদ মালেক

বিবাহ সংবাদ ৩০

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি ৩১
হিফ্‌যুল কুরআন একাডেমী, বাংলাদেশ

জীবন উৎসর্গকারী (ওয়াকফে যিন্দেগী)-এর অঙ্গীকার পত্র ৩২

প্রচ্ছদ পরিচিতি:

পাকশী হার্ডিঞ্জ ব্রিজ: মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত পাকশী হার্ডিঞ্জ ব্রিজের চারপাশ জুড়ে রয়েছে বধ্যভূমি ও গণকবর। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী সেনারা পাবনার বিভিন্ন এলাকা থেকে শতশত মুক্তিকামী মানুষকে ধরে এনে এখানে হত্যা করে। হার্ডিঞ্জ ব্রিজের অদূরে পাকশী নর্থবেঙ্গল পেপার মিলের গেস্টহাউজে পাকিস্তানী বাহিনীর ক্যাম্প ছিল। তারা হত্যাকাণ্ডের জন্য এ জায়গাটি বেছে নিয়েছিল।

১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে পাকিস্তানী সেনারা পালিয়ে পাকশী হার্ডিঞ্জ ব্রিজ পার হয়ে দক্ষিণবঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গের দিকে এসেছিল। ওইদিন দলে দলে পাকিস্তানী সেনারা হার্ডিঞ্জ ব্রিজ পার হতে থাকে। অবস্থা বেগতিক দেখে মুক্তিযোদ্ধারা ঈশ্বরদী-কুষ্টিয়া মহাসড়কের পাশে চরসাহাপুরে অবস্থান নিয়ে পাকিস্তানী সেনাদের আত্মসমর্পণের জন্য আহ্বান জানান। কিন্তু পাকিস্তানী সেনারা মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর গুলিবর্ষণ করতে থাকে, মুক্তিযোদ্ধারাও পাল্টা গুলি ছোঁড়ে।

হার্ডিঞ্জ ব্রিজের ওপর দিয়ে ট্যাংক, কামান, জিপ নিয়ে পার হতে থাকে পাকিস্তানী সেনারা। এমন পরিস্থিতিতে ভারতীয় মিত্রবাহিনীর কাছে ওয়্যারলেসের মাধ্যমে বিমানবাহিনীর সহযোগিতা চাওয়া হয়। তখন ১৪ ডিসেম্বর দুপুরে দিকে পাঁচটি ভারতীয় যুদ্ধবিমান হার্ডিঞ্জ ব্রিজ এলাকায় বোমাবর্ষণ করতে থাকে। এসময় একটি বোমা হার্ডিঞ্জ ব্রিজের ওপর ফেলা হয়। বোমার আঘাতে ব্রিজের ১২ নম্বর স্প্যান ভেঙে যায়। এসময় পাকিস্তানী সেনারা ট্যাংক ও অস্ত্র হার্ডিঞ্জ ব্রিজের ওপর রেখে পালাতে শুরু করে। *(তথ্যসূত্র: https://www.jagonews24.com/country/news/818132)*
(পাকশী হার্ডিঞ্জ ব্রিজের দৃশ্যটি ধারণ করেছেন পাক্ষিক 'আহ্‌মদী' পত্রিকার নিজস্ব প্রতিনিধি)

'আহ্‌মদী' পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের একমাত্র মুখপত্র 'আহ্‌মদী' পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে এ দিকনির্দেশনা দেয়া যাচ্ছে যে, এখন থেকে যারাই এতে লেখা ও সংবাদ পাঠাতে ইচ্ছুক, তারা এ পত্রিকার সম্পাদক বরাবর নিম্ন ঠিকানায় পাঠাবেন।

বরাবর– **সম্পাদক**, পাক্ষিক আহ্‌মদী
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১।
E-mail: pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com

কুরআন শরীফ

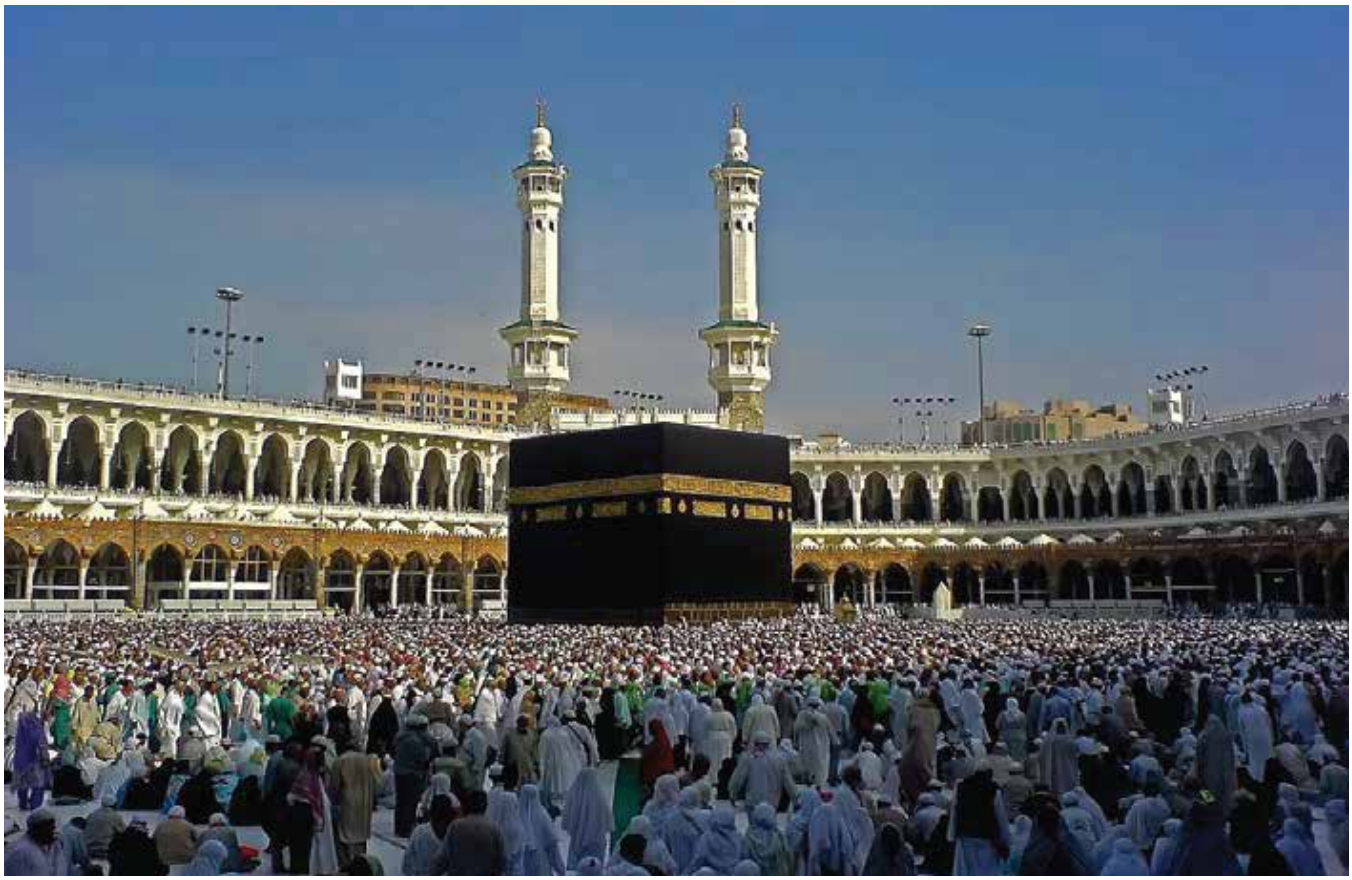

اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ یُمِیْتُكُمْ ثُمَّ یُحْیِیْكُمْ ؕ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ یَّفْعَلُ مِنْ ذٰلِكُمْ مِّنْ شَیْءٍ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَ تَعٰلٰی عَمَّا یُشْرِكُوْنَ

(সূরা আর-রূম: ৪১)

অনুবাদ: আল্লাহ্ সেই মহান সত্তা যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন আর তিনি তোমাদের রিযিকের ব্যবস্থা করেছেন এরপর তিনি তোমাদের মৃত্যু দিবেন অতপর তোমাদেরকে জীবিত করবেন। তোমরা যাদেরকে (আল্লাহ্‌র) শরীক সাব্যস্ত করো তাদের মাঝে কেউ কি এরূপ কিছু করতে পারে? তিনি অতিব পবিত্র এবং তারা যেসব শরীক সাব্যস্ত করে তিনি এগুলোর উর্ধ্বে।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

আল্লাহ্ তা'লার মহিমা ও ক্ষমতার জ্ঞান মানুষের যত বেশি থাকবে এবং যত বেশি এ বিশ্বাস থাকবে যে, তাঁর অবাধ্য হলে কঠোর শাস্তি নির্ধারিত, তত বেশি পাপকর্ম ও অবাধ্যতা এবং নির্দেশ অমান্য করা থেকে মানুষ বিরত থাকবে। লক্ষ্য কর! কতিপয় ব্যক্তি মৃত্যুর ক্ষণ আসার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করছে। এই সৎলোক, ওলী ও দরবেশ কারা হয়ে থাকে? আর তাদের মাঝে অতিরিক্ত কী গুণাবলীই বা রয়েছে? সেটি এ বিশ্বাসই। বিশ্বাসগত ও পরিপক্ক জ্ঞান মানুষকে আবশ্যিকভাবে ও স্বভাবগতভাবে একটি কাজ বাস্তবায়ন করতে বাধ্য করে। আল্লাহ্ তা'লা সম্পর্কে সীমিত ধারণা পোষণ করা সম্ভব নয়। সন্দেহ প্রবণতা উপকারী বলে সাব্যস্ত হতে পারে না। বিশ্বাসেই কেবলমাত্র প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা রাখা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার গুণাবলীর প্রতি বিশ্বাসগত জ্ঞান এক ভয়ানক বজ্রপাত অপেক্ষা বেশি প্রভাব বিস্তারকারী হয়ে থাকে। তার প্রভাবেই এ সমস্ত লোক মস্তক অবনত করে ও গলা বাড়িয়ে দেয়। সুতরাং স্মরণ রেখো! (আল্লাহ্‌র প্রতি) যার বিশ্বাস যত বেশি থাকবে সে ততবেশি পাপ থেকে পরিত্রাণ পাবে। *(মালফুযাত, দশম খণ্ড, পৃ. ৩২০-৩২১)*

হাদীস শরীফ

وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن : إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له"(*সহীহ্ মুসলিম, হাদীস নং ২৯৯৯*)

হযরত আবু ইয়াহ্ইয়া সুহাইব ইবনে সিনান (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, "মু'মিনের প্রতিটি বিষয়ই আশ্চর্যজনক। তার প্রতিটি কাজে তার জন্য মঙ্গল রয়েছে। এটি মু'মিন ব্যতীত অন্য কারও জন্য প্রযোজ্য নয়। অতএব সে সুখের সময় আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, ফলে এটি তার জন্য মঙ্গলময় হয় আর দুঃখের সময় সে ধৈর্যধারণ করে, ফলে এটিও তার জন্য মঙ্গলময় হয়।"

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা:

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন: "যারা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধৈর্যধারণ করে না, তাদেরকেও অবশেষে ধৈর্যধারণ করতে হয় কিন্তু সেটি তাদের পুণ্য ও প্রতিদানের কারণ হয় না। কোনো আত্মীয় মারা গেলে মহিলারা বিলাপ করে। অনেক অবোধ পুরুষ মাথায় ছাই ঢালতে থাকে। অল্পদিন পরেই সবাই ধৈর্যধারণ করে এবং পূর্বের সবকিছু ভুলে যায়। একদা এক মহিলার সন্তান মারা যায় আর সে সন্তানের কবরে দাঁড়িয়ে বিলাপ করতে থাকে। মহানবী (সা.) সেখান দিয়ে যাওয়ার সময় মহিলাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং ধৈর্যধারণ কর।' সেই অভাগা মহিলা বলে, 'তুমি পথ মাপ, আমার মত বিপদে তুমি তো পড় নি।' সেই অভাগা মহিলার জানা ছিল না, মহানবী (সা.) এগারো সন্তানের বিয়োগ বেদনা সহ্য করেছেন। একসময় সেই মহিলা যখন জানতে পারে যে, তাকে উপদেশ প্রদানকারী ছিলেন স্বয়ং মহানবী (সা.) তখন সে তাঁর (সা.) গৃহে আসে এবং বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি এখন ধৈর্যধারণ করেছি। তখন মহানবী (সা.) বলেন, 'দুঃখে নিপতিত হওয়ার সাথে সাথে ধৈর্যধারণ করাই প্রকৃত ধৈর্যধারণ।' অতএব সময় অতিক্রান্ত হলে একসময় ধৈর্যধারণ করতেই হয় তবে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে প্রথমেই ধৈর্যধারণ করা প্রকৃত ধৈর্যধারণ। আল্লাহ্ তা'লা ধৈর্যধারণকারীদের অশেষ পুরস্কার প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এই অশেষ পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি কেবল ধৈর্যধারণকারীদের জন্যই বরাদ্দ। *(মালফুযাত, দশম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৮৯)*

অমৃতবাণী

জান্নাতেও একপ্রকার দেহ লাভ হবে!

দুষ্টুমির ছলে কাফেররা মহানবী (সা.)-এর কাছে এই দাবী জানিয়েছিল যে, আপনি আকাশে আরোহন করে দেখান। এর কারণ হল, পূর্বে তারা সেই আয়াত শুনেছিল যেখানে এ বিষয়টি অস্বীকার করা হয়েছিল। তারা ভেবে দেখল, এখন যদি তিনি (সা.) এ বিষয়টি স্বীকার করে নেন তাহলে আপত্তি করার সুযোগ সৃষ্টি হবে। কিন্তু তা তো ছিল আল্লাহ্ তা'লার বাণী। এর মাঝে কোনো স্ববিরোধ থাকতে পারে না। আসল কথা হল, (মৃত্যুর পর) অবশ্যই একপ্রকার দেহ লাভ হয় কিন্তু নশ্বর এই দেহ জগতেই থেকে যায়, এ নশ্বর দেহ আকাশে যেতে পারে না। যেমন মহানবী (সা.) কাফেরদের কথার উত্তরে বলেছিলেন,

"কুল সুবহানা রাব্বী, হাল কুনতু ইল্লা বাশারান রাসূলান" (বনী ইসরাঈল: ৯৪) অর্থাৎ তুমি তাদেরকে বলে দাও, এমন অলৌকিক নিদর্শন দেখানো আমার প্রভূর বাণী বিরোধী আর আমার প্রভু পূর্বে যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, নিজ সকল প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা থেকে তিনি পবিত্র।

মোটকথা, কত গুরুত্বপূর্ণ কথা আল্লাহ্ তা'লা বার বার উপস্থাপন করেছেন কিন্তু হায় পরিতাপ! অবাক হতে হয়, এরা একথা বুঝে না আর অযথাই হযরত মসীহ্ (আ.)-এর মাঝে এমন বিশেষত্ব সৃষ্টি করতে চায় যা অন্যদের মাঝে নেই। পবিত্র কুরআনের উক্ত শিক্ষা, পাশাপাশি সহীহ্ বুখারী এবং সহীহ্ মুসলিম শরীফের প্রতি দৃষ্টি দাও, এছাড়া অন্যান্য সহীহ্ হাদীসসমূহ পাঠ করে দেখ, সেখানে মহানবী (সা.)-এর রুইয়ার উল্লেখ আছে। তিনি (সা.) হযরত মসীহ্ (আ.)-কে হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর সাথে দেখেছেন। সেসময় হযরত মসীহ্ (আ.)-এর ভিন্ন দেহসম্বলিত বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য তিনি (সা.) দেখেন নি। অর্থাৎ তিনি দেহধারী ছিলেন আর হযরত ইয়াহইয়া (আ.) দেহহীন এক আত্মা ছিলেন– [এমনটি তিনি (সা.) দেখেন নি]। যেক্ষেত্রে আমাদের সম্মুখে পবিত্র কুরআন আছে, মহানবী (সা.)-এর সুস্পষ্ট সাক্ষ্যও বিদ্যমান তাহলে ভিন্ন দেহের ধারণা কীভাবে আসতে পারে? অতএব যদি তাদের উভয়ের মাঝে দৈহিক কোনো পার্থক্য না থেকে থাকে (আর ছিলও না) সেক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র নামে আমরা বিশ্বাস রাখছি, মৃত্যুর পর যে দেহ আত্মা লাভ করে, হযরত মসীহ্ (আ.)-কেও সেই দেহ দান করা হয়েছিল। মসীহ্‌কে ভিন্ন কোনো দেহ দেয়ার কথা আমরা বিশ্বাস করতে পারি না কেননা এমনটি বিশ্বাস করা 'শির্ক'। আমরা তাঁর (মৃত্যুর পর) একপ্রকার দেহ লাভ হওয়া তো স্বীকার করি কিন্তু এই নশ্বর দেহসহ অবস্থান বিশ্বাস করি না। অতএব আমরা বিশ্বাস করি, জান্নাতেও একপ্রকার দেহ লাভ হবে। *(মালফুযাত: অষ্টম খণ্ড, পৃ. ৫৬-৫৭)*

১৫ জুলাই, ২০২২ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডে অবস্থিত মুবারক মসজিদে প্রদত্ত

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর জুমুআর খুতবা

বিষয়:
হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর স্মৃতিচারণ

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

মুরতাদ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে মুসলামানদের গৃহীত কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আলোচনা চলছে। এ সম্পর্কে হযরত মুহাজির এবং হযরত ইকরাম (রা.)-এর কিন্দা ও হাযারা মওত অঞ্চলে মুরতাদদের বিরুদ্ধে যেসব কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছিল তাতে আরও যাকিছু বিষয় বর্ণিত হয়েছে তা হল, সানায় যখন হযরত মুহাজির (রা.)-এর স্থিতি লাভ হয়, অথাৎ অবস্থান দৃঢ় হয়ে যায় তখন তিনি (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে পত্র মারফত নিজের সমস্ত কার্যক্রম সম্পর্কে অবগত করে উত্তরের অপেক্ষায় থাকেন। এমন সময় হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.) এবং ইয়ামেনে অন্য যে–সব শাসক মহানবী (সা.)-এর যুগ থেকে শাসন করছিলেন তারা হযরত আবু বকর (রা.)-এর সমীপে পত্র প্রেরণ করে মদীনায় ফিরে আসার অনুমতি প্রার্থনা করেন। তখন হযরত আবু বকর (রা.) হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.) এবং তাঁর সাথে অন্যান্য শাসককে ইয়েমেনে থাকার বা মদীনায় ফিরে আসার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা প্রদান করেন। তবে শর্ত দেন, নিজের স্থলে অন্য কাউকে নিযুক্ত করে আসতে হবে। সিদ্ধান্তের স্বাধীনতা পাওয়ার পর সবাই ফিরে আসেন। তখন হযরত মুহাজির এ নির্দেশ প্রাপ্ত হন যে, ইকরামার সাথে যোগ দাও দুজনে মিলে হাযারা মওতে উপস্থিত হয়ে যিয়াদ বিন লাবীকে সঙ্গ দাও। এছাড়া [হযরত আবু বকর (রা.)] তাঁকে তার স্বপদে বহাল

রেখে এ নির্দেশ দেন যে, তোমার সাথে যুক্ত হয়ে যারা মাক্কা ও ইয়ামেনের মধ্যবর্তী অঞ্চলে জেহাদ করেছে তাদেরকে ফিরে আসার অনুমতি দাও। ফিরে আসতে চাইলে আসতে পার কিন্তু জেহাদে অংশগ্রহণকে প্রাধান্য দিবে। লোকেরা নিজেই বলুক, আমরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে চাই। হযরত ইকরামা (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-এর পক্ষ থেকে পত্র প্রাপ্ত হন তাতে তাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, সানা থেকে আগত মুহাজির বিন আবু উমাইয়ার সাথে গিয়ে সাক্ষাৎ কর এবং দুজনে মিলে কিন্দা অভিমুখে অগ্রসর হও। এই পত্র পাওয়া মাত্র হযরত ইকরামা মাহ্‌রা থেকে বের হয়ে আবইয়ানে যাত্রা বিরতি দিয়ে মুহাজির বিন আবু উমাইয়ার জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। আবইয়ানও ইয়ামেনের একটি জনবসতির নাম।

কিন্দা গোত্রের মুরতাদদের বিরুদ্ধে কার্যক্রমপ্রসঙ্গে তাবারীর ইতিহাস গ্রন্থে লিখা আছে, মুরতাদ হওয়ার পূর্বে কিন্দা ও হাযারা মওতের সমগ্র অঞ্চলের (মানুষ) যখন ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেয় তখন তাদের কাছ থেকে যাকাত সংগ্রহের ব্যাপারে মহানবী (সা.) বলেছিলেন, হাযারা মওতের কিছু লোকের যাকাত কিন্দাতে জমা করবে এবং কতক কিন্দাবাসীর যাকাত হাযারা মওতে সমবেত করবে। অর্থাৎ সেখানে যেন পাঠিয়ে দেয়া হয় অর্থাৎ যেন পরস্পরের জন্য ব্যয় করা হয়। এছাড়া হাযারা মওতের অধিবাসীদের কারও কারও যাকাত সকুনে এবং সকুনবাসী কারও কারও যাকাত হাযারা মওতে জমা করবে। এ প্রেক্ষিতে কিন্দার কিছু লোক বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমাদের কাছে উট নেই আপনি যদি সঙ্গত মনে করেন তাহলে তারা আমাদের কাছে যাকাতের অর্থসম্পদ বাহনে করে পৌঁছে দিলে ভাল হয়। একথা শুনে মহানবী (সা.) তাদেরকে, অর্থাৎ হাযারা মওতের অধিবাসীদের বলেন, তোমাদের পক্ষে এটি করা সম্ভব হলে তোমরা এমনটি করো। তারা উত্তর দেয়, আমরা দেখব, তাদের কাছে যদি (বাহনের জন্য) পশু না থাকে তাহলে আমরা এমনটি করব। কিন্তু এরপর মহানবী (সা.) যখন মৃত্যুবরণ করেন এবং যাকাত প্রদানের সময় হয় তখন লোকদেরকে যিয়াদ নিজের কাছে আসতে বললে তার কাছে আসে আর বনু ওয়ালীয়া, অর্থাৎ কিন্দাবাসী বলে, যেভাবে তোমরা মহানবী (সা.)-এর সাথে অঙ্গীকার করেছিলে সে অনুসারে যাকাতের অর্থসম্পদ আমাদের কাছে পৌঁছে দাও। তখন তিনি বলেন, তোমাদের কাছে তো ভারবাহী পশু রয়েছে, তোমরা তোমাদের পশু নিয়ে এসে তোমাদের যাকাতের অর্থসম্পদ নিয়ে যাও। তিনি নিজে যাকাত পৌঁছে দিতে অস্বীকৃতি জানান, কিন্তু কিন্দা তাদের দাবিতে অনড় থাকে। এরপর তারা নিজ নিজ গৃহে চলে যায়। তাদের আচরণ নড়বড়ে হয়ে যায়। এক পা আগে বাড়ালে আরেক পা পিছিয়ে যেতো আর যিয়াদ মুহাজেরের প্রতীক্ষায় তাদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণে বিরত থাকেন, অর্থাৎ যারা যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল তাদের বিরুদ্ধে তিনি কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নি যাতে অর্থাৎ হযরত মুহাজিরমুহাজেরের আসার অপেক্ষায় থাকেন। হযরত আবু বকর (রা.) যখন মুহাজির এবং হযরত ইকরামা (রা.)কে এই পত্র প্রেরণ করেন যে, তোমরা দুজন হাযারা মওতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যাও এবং যিয়াদকে তার দায়িত্বে বহাল রাখবে। মক্কা থেকে ইয়েমেনের মধ্যবর্তী অঞ্চলের যেসব লোক তোমাদের সাথে আছে তাদেরকে ফিরে যাওয়ার অনুমতিদাও, কেবল তারা ছাড়া যারা সানন্দে জেহাদে অংশগ্রহণ করতে চায়। এছাড়া উবায়দা বিন সা'দকে যিয়াদের সাহায্যের জন্য পাঠিয়ে দাও। সে অনুসারে হযরত মুহাজির (রা.) এই নির্দেশের ওপর আমল করেন। তিনি সানআ থেকে হাযারা মওতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন এবং ইকরামা আবইয়ান থেকে হাযার মওতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন আর মাআরেব নামক স্থানে উভয়ে মিলিত হন। তারা উভয়ে সুহায়েদ মরুভূমি পাড়ি দিয়ে হাযারা মওতে পৌঁছেন। কিন্দা (গোত্র) যখন হযরত যিয়াদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে ফেরত যায় তখন হযরত যিয়াদ বনু আমরের কাছ থেকে যাকাত আদায়ের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন। কিন্দার এক যুবক ভুলবশত তার ভাইয়ের একটি উটনী যাকাতের উট হিসেবে দিয়ে দেয়। হযরত যিয়াদ সেটির গায়ে আগুন দিয়ে দাগিয়ে অর্থাৎ মোহর লাগিয়ে দেয়া হয় যে, এটি বায়তুল মাল বা যাকাতের সম্পদ। সেই ছেলে যখন উট পাল্টে দেয়ার জন্য বলে যে, ভুলে এটি হয়ে গিয়েছিল তখন হযরত যিয়াদ মনে করেন সে অযুহাত দেখাচ্ছে। সে কারণে তিনি তাতে রাজি হন নি। ফলে সে তখন তার গোত্রের লোকদের এবং আবু সুমায়েদকে সাহায্যের জন্য আহ্বান জানায়, অর্থাৎ যে উটনী দিয়েছিল সে। আবু সুমায়েদ যখন হযরত যিয়াদের কাছে উটনী পাল্টে দেয়ার দাবি করে তখন হযরত যিয়াদ তার অবস্থানে অটল থাকেন। আবু সুমায়েদ রেগে গিয়ে জোর করে উটনীর বাঁধন খুলে দেয় যার ফলে হযরত যিয়াদের সঙ্গিরা আবু সুমায়েদ ও তার সাথিদে বন্দী করে এবং উটনীও নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়। তারা পরস্পরের সাহায্যের জন্য ডাকাডাকি করে। অতঃপর বনু মুআবিয়া আবু সুমায়েদকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে। কিন্দা গোত্রেরই দুশাখার একটি হল বনু হারেস আর বনু আমর বিন মুআবিয়া হল অপরটি। তারা হযরত যিয়াদের কাছে নিজ সাথিদের মুক্তির দাবি জানায়, কিন্তু হযরত যিয়াদ তাদের চলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত বন্দিদের মুক্তি দিতে অস্বীকৃতি জানান। তিনি বলেন, এভাবে নয় বরং তোমরা চলে যাও, তারপর আমি দেখব। তাদের না যাওয়ার কারণে হযরত যিয়াদ তাদের ওপর আক্রমণ করে তাদের অনেক মানুষকে হত্যা করে আর কিছু

মানুষ সেখান থেকে পলায়ন করে। হযরত যিয়াদ ফেরত এসে তাদের বন্দিদের মুক্ত করে দেন, কিন্তু তারা ফিরে গিয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে আরম্ভ করে। ফলে বনু আমর, বনু হারেস ও আশআস বিন কায়েস এবং সিম্‌ত বিন আসওয়াদ নিজ নিজ বুহ্যে চলে যায় আর যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে মুরতাদ হয়ে যায়। ফলে হযরত যিয়াদ সৈন্য একত্রিত করে বনু আমরের ওপর আক্রমণ করলে তাদের অনেক মানুষ মারা যায় আর যারা পালিয়ে যেতে পেরেছে তারা পালিয়ে যায়। হযরত যিয়াদ একটি বিশাল সংখ্যাকে বন্দি করে মদীনায় পাঠিয়ে দেন। পথিমধ্যে আশআস এবং বনু হারেসের লোকেরা আক্রমণ করে মুসলমানদের কাছ থেকে তাদের বন্দিদের ছিনিয়ে নেয়। এই ঘটনার পর চতুর্দিকের বিভিন্ন গোত্রও তাদের সাথে মিলিত হয় এবং তারাও প্রকাশ্যে মুরতাদ হবার ঘোষণা দেয়। একারণে হযরত যিয়াদ সাহায্য চেয়ে হযরত মুহাজিরের নিকট পত্র লিখেন। হযরত মুহাজির হযরত ইকরামাকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন এবং নিজে সঙ্গিদের সাথে নিয়ে কিন্দা গোত্রের ওপর আক্রমণ করেন। কিন্দার লোকেরা পালিয়ে নুজায়ের নামক তাদের এক দুর্গে আশ্রয় নেয়। এটিও হাযারা মওতের নিকটবর্তী ইয়েমেনের একটি দুর্গ ছিল। এই দুর্গের তিনটি রাস্তা ছিল। একটি পথে হযরত যিয়াদ অবতরণ করেন, দ্বিতীয় পথে হযরত মুহাজির শিবির স্থাপন করেন এবং তৃতীয় রাস্তাটি কিন্দার নিয়ন্ত্রণে ছিল। এক পর্যায়ে হযরত ইকরামা সেখানে পৌঁছে যান এবং সেটির দখল নিয়ে নেন।

হযরত যিয়াদ এবং হযরত মুহাজির (রা.)-এর সেনাবাহিনীতে পাঁচ হাজার মুহাজির ও আনসার সাহাবা এবং বিভিন্ন গোত্রের লোক ছিল। নুজায়ের দুর্গে অবরুদ্ধ লোকেরা যখন দেখতে পায়, মুসলমানরা লাগাতার সাহায্য পাচ্ছে তখন তারা ভয় পেয়ে যায়। এজন্য তাদের নেতা আশআস তৎক্ষণাৎ হযরত ইকরামা (রা.)-এর নিকট পৌঁছে নিরাপত্তা প্রার্থী হয়। হযরত ইকরামা (রা.) আশআ'সকে নিয়ে হযরত মুহাজির (রা.)-এর নিকট আসেন। আশআ'স তার নিজের এবং তার সাথের নয়জন ব্যক্তির জন্য এই শর্তে নিরাপত্তা প্রর্থনা করে যে, সে মুসলমানদের জন্য দুর্গের দরজা খুলে দিবে। হযরত মুহাজির এই শর্ত মেনে নেন। আশআ'স নয়জন ব্যক্তির নাম লিখার সময় তাড়াহুড়া ও ভয়ের কারণে নিজের নামই লিখতে ভুলে যায়। এরপর সে হযরত লিখিত চুক্তিনামামুহাজির (রা.)-এর নিকট নিয়ে যায়। সেটিতে তিনি (রা.) মোহরাঙ্কিত করেন বা সিল মেরে দেন। এরপর আশআ'স ফিরে গিয়ে দুর্গের দরজা খুলে দিলে মুসলমানরা তাতে প্রবেশ করে। উভয় পক্ষের যুদ্ধে সাতশ' কিন্দিকে হত্যা করা হয়। অর্থাৎ, দুর্গের লোকেরা (ও) মোকাবিলা করে এবং যুদ্ধ করে। যাহোক, তাদের লোকদেরহত্যা করা হয় এবং এক হাজার মহিলাকে বন্দি করা হয়। এরপর হযরত মুহাজির নিরাপত্তাপত্র আনান এবং এতে উল্লিখিত সবাইকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু এতে আশআ'সের নাম ছিল না, তাই হযরত মুহাজির (রা.) তাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেন, কিন্তু হযরত ইকরামা (রা.)-এর অনুরোধে তাকে অন্য বন্দিদের সাথে হযরত আবু বকর (রা.)-এর সমীপে পাঠিয়ে দেন, যাতে এর সম্পর্কেও হযরত আবু বকর (রা.)-ই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মুসলমানরা যখন বিজয়ের সংবাদ এবং বন্দিদের নিয়ে হযরত আবু বকর (রা.)-এর সকাশে উপস্থিত হন তখন তিনি (রা.) আশআ'সকে ডেকে এনে বলেন, তুমি বনু ওলিয়্যার প্রতারণার শিকার হয়েছ আর তারা এমন নয় যে, তুমি তাদেরকে ধোঁকা দিতে পার আর তারাও তোমাকে এ কাজের যোগ্য মনে করত না। তারা নিজেরাও ধ্বংস হয়েছে আর তোমাকেও ধ্বংস করেছে। তুমি কি এতে ভীত নও যে, তুমি মহানবী (সা.)-এর বদ-দোয়ার শিকার হবে। প্রকৃতপক্ষে কিন্দা গোত্রের চার নেতার প্রতি মহানবী (সা.) অভিসম্পাত করেছিলেন যারা আশআ'সের সাথে ইসলাম গ্রহণ করেছিল কিন্তু পরে মুরতাদ হয়ে যায়। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, তুমি কী মনে হয়? আমি তোমার সাথে কী ব্যবহার করব? আশআ'স বলে, আপনার মতামত কি তা আমি জানি না। (তখন) হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমার মতে তোমাকে হত্যা করা উচিত। তখন সে বলে, আমি সেই ব্যক্তি যে স্বগোত্রীয় দশজন মানুষের প্রাণভিক্ষার চুক্তি করিয়েছে, আমাকে হত্যা (করা) কীভাবে যুক্তিযুক্ত হতে পারে? তিনি (রা.) বলেন, মুসলমানরা কি বিষয়টি (অর্থাৎ তালিকা দেয়ার) দায়িত্ব তোমার হাতে দিয়েছিল? সে বলে, জী হ্যাঁ। তখন হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, বিষয়টি যখন তোমার দায়িত্বে দিয়েছিল আর তুমি তাদের কাছে (তালিকা নিয়ে) এসেছিলে তখন কি তারা তাতে মোহরাঙ্কিত করেছিল বা সত্যায়ন করেছিল? সে বলে, জী হ্যাঁ! তখন তিনি (রা.) বলেন, লিখিত চুক্তি (তালিকা) সত্যায়ন করার পর সে অনুসারে চুক্তি কার্যকর করাআবশ্যক হয়ে গেছে। এর পূর্বে তুমি শুধু আপোষ-মীমাংসার আলোচনা করছিলে। আশআ'স যখন (এই) ভয় পায় যে, তার মৃত্যু অনিবার্য তখন সে নিবেদন করে, আপনি যদি আমার কাছ থেকে কোনো মঙ্গলের প্রত্যাশা করেন তাহলে এই বন্দিদের মুক্ত করে দিন আর আমার সকল দুর্বলতা ক্ষমা করুন এবং আমার ইসলাম কবুল করুন। এছাড়া আমার সাথে সেই ব্যবহারই করুন যা আপনি আমার মত লোকদের সাথে করে থাকেন। আর আমার স্ত্রীকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিন। লেখা আছে– এ ঘটনার পূর্বে আশআ'স একবার মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়েছিল এবং হযরত আবু বকর (রা.)-এর বোন উম্মে ফারওয়া বিন আবু কোহাফাকে বিয়ে প্রস্তাব দিয়েছিল। হযরত আবু কোহাফা নিজ

কন্যাকে তার সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। রুখসাতানা বা কন্যাদানের বিষয়টি আশআ'সের পরের যাত্রার জন্য রেখে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ, পরেরবার আসলে কন্যাদান করা হবে। জনৈক লেখক হযরত উম্মে ফারওয়াকে হযরত আবু বকর (রা.)-এর কন্যা আখ্যা দিয়েছেন। যাহোক, পরে মহানবী (সা.) মৃত্যুবরণ করেন আর আশআ'স মুরতাদ ও বিদ্রোহী হয়ে যায়। তাই তার সন্দেহ হয়, হয়ত তার স্ত্রীকে তার কাছে তুলে দেয়া হবে না। আশআ'স হযরত আবু বকর (রা.)-এর নিকট নিবেদন করে, আপনি আমাকে আল্লাহ্‌র ধর্মের সেবায় আপনার অঞ্চলের সর্বোত্তম লোকদের মাঝে পাবেন। তখন হযরত আবু বকর (রা.) তার প্রাণ ভিক্ষা দেন এবং তার ইসলাম কবুল করেন এবং তার স্ত্রীকে তার হাতে তুলে দেন। অধিকন্তু বলেন, যাও; তোমার সম্পর্কে আমার কাছে যেন কল্যাণকর সংবাদই আসে। এভাবেই হযরত আবু বকর (রা.) সকল বন্দিকেও মুক্ত করে দেন এবং তারা নিজ নিজ অঞ্চলে চলে যায়। একটি রেওয়ায়েত অনুসারে নিজ গোত্রের সাথে অঙ্গীকারভঙ্গের কারণে আশআ'স নিজ গোত্রে ফিরে যাওয়ার সাহস হারিয়ে ফেলে, আর বন্দিদশা থেকে মুক্তিলাভের পর সে উম্মে ফারওয়ার সাথে মদীনাতেই বসবাস করেন। হযরত উমরের (রা.)-এর যুগে যখন ইরাক ও সিরিয়ার যুদ্ধ আরম্ভ হয় তখন সে-ও ইসলামী সেনাবাহিনীর সাথে ইরানী ও রোমানদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য বেরিয়ে পড়ে এবং উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে, যেকারণে মানুষের দৃষ্টিতে তার সম্মান পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং সে তার হারানো সম্মান ফিরে পায়। মোটকথা, পূর্ণ নিরাপত্তা ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত না হওয়া এবং ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত হযরত মুহাজির ও হযরত ইকরামা (রা.) হাযার মওত ও কিন্দাতেই অবস্থান করেন। মুরতাদ বিদ্রোহীদের সাথে এগুলো ছিল সর্বশেষ যুদ্ধ ছিল যার পরে আরবে বিদ্রোহ সম্পূর্ণরূপে নির্মূল হয়ে যায় এবং সকল গোত্র ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে চলে আসে। হযরত মুহাজির ঐ অঞ্চলে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা এবং বিদ্রোহ ও অবাধ্যতার সকল উপাদান সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করতে সেরূপ কঠোরতার সাথে কাজ করেন যেমনটি তিনি ইয়েমেনে করেছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) হযরত মুহাজির (রা.)-কে ইয়েমেন ও হাযার মওত এর মধ্য থেকে যে-কোনো একটি অঞ্চলকে নির্বাচন করার জন্য লিখলে তিনি ইয়েমেনকে নির্বাচন করেন আর এভাবে ইয়েমেনে দু'জন আমীর নিযুক্ত হন। হযরত আবু বকর (রা.) মুরতাদ ও বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কর্মরত গভর্নরদের লিখেন যে,

পরসমাচার, আমার মতে অধিক পছন্দনীয় বিষয় হল; আপনারা রাষ্ট্রপরিচালনায় শুধুমাত্র সেসব লোককেই অন্তর্ভুক্ত করুন যারা বিদ্রোহ ও ধর্মত্যাগের কালিমা থেকে মুক্ত ছিল। (যদিও তারা এখন ফিরে এসেছে, কিন্তু এটা দেখুন যে, এদের মাঝে তারা নেই তো যারা ইতোপূর্বে ধর্মত্যাগ করেছিল অথবা বিদ্রোহ করেছিল।) এরপর তিনি (রা.) বলেন, আপনারা সবাই এর ওপর আমল করুন এবং এই (নীতিই) অবলম্বন করুন। সেনাবাহিনী থেকে যারা ফেরত আসতে চায় তাদেরকে ফিরে আসার অনুমতি দিন আর শত্রুদের সাথে জেহাদ করার ক্ষেত্রে কোনো ধর্মত্যাগী বিদ্রোহীর সাহায্য গ্রহণ করবেন না।

অধিকাংশ লেখক আর বিশেষভাবে এ যুগের জীবনীকারকরা সাধারণত হযরত আবু বকর (রা.)-এর এসব যুদ্ধের উল্লেখ করতে গিয়ে বর্ণনা করেন, যারা নবুয়্যতের মিথ্যা দাবি করেছিল তাদের বিরুদ্ধে এসব জেহাদ করা হয়েছিল; আর তরবারির জোরে নির্মূল করা হয়েছে। কেননা, এটাই তাদের জন্য শরীয়তসম্মত শাস্তি ছিল। কিন্তু ইতিহাস ও জীবনীগ্রন্থ অধ্যয়নকারী কখনও এ কথার সমর্থন করতে পারে না। যেমনটি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর পবিত্র কর্মপন্থা ও হাদীসের আলোকে পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, শুধুমাত্র নবুয়্যতের দাবি করার কারণে মহানবী (সা.)ও কখনও (শাস্তিমূলক) পদক্ষেপ নেন নি, আর হযরত আবু বকর (রা.)-এর এসব যুদ্ধাভিযানও শুধুমাত্র এ কারণে ছিল না যে, নবুয়্যতের মিথ্যা দাবীদারদের নির্মূল করা হোক; বরং মূল কারণ ছিল তাদের বিদ্রোহপূর্ণআচরণ। অতএব, এই বিষয়টি স্পষ্ট করতে গিয়ে যে, সাহাবীরা কেন নবুয়্যতের দাবীদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, এবং এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন,

মাওলানা মওদুদী সাহেবের একথা লেখা যে, সাহাবীরা প্রত্যেক সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন যারা মহানবী (সা.)-এর পরে নবুয়্যতের দাবি করেছিল, এটি সাহাবীদের বক্তব্য পরিপন্থী। মাওলানা মওদুদী সাহেবের এ কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, (এটি তার জীবদ্দশার কথা) মহানবী (সা.)-এর পর যারা নবুয়্যতের দাবি করেছিল এবং সাহাবীরা যাদের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন তারা সবাই এমন (মানুষ) ছিল যারা ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল ও ইসলামী সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছিল। তিনি (রা.) বলেন, মাওলানা সাহেবের ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়নের বড় বড় দাবি রয়েছে, (কিন্তু) আক্ষেপ! তিনি যদি এ বিষয়ে নিজের মতামত প্রকাশের পূর্বে ইসলামী ইতিহাস পাঠ করে দেখতেন তাহলে তিনি জানতে পারতেন, মুসায়লামা কায্‌যাব, আসওয়াদ আনসী, সাজাহ্ বিনতে হারেছ ও তুলায়হা বিন খুওয়াইলেদ আসাদী– এরা সবাই এমন মানুষ ছিল যারা মদীনা রাষ্ট্রের আনুগত্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল এবং স্ব-স্ব অঞ্চলে নিজেদের সরকারের ঘোষণা দিয়েছিল। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)

লিখেছেন, মাওলানা সাহেব যদি মনোযোগ দিয়ে তারীখ ইবনে খলদূন পাঠ করতেন তাহলে এটি স্পষ্ট হয়ে যেতো যে, তার অর্থাৎ, মাওলানা সাহেবের দৃষ্টিভঙ্গি (সম্পূর্ণ) ভুল। অতএব, সেখানে লিখিত আছে;

গোটা আরববাসী, তা সাধারণ হোক বা বিশেষ শ্রেণির, তাদের ধর্মত্যাগের সংবাদ মদীনায় পৌঁছে। কেবলমাত্র কুরাইশ ও সাকীফ– এ দুটি গোত্র ছিল যারা ধর্মত্যাগ থেকে মুক্ত ছিল। আর মুসায়লামার বিষয়টি অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠে এবং তায়ে ও আসাদ গোত্র তুলায়হা বিন খুওয়াইলেদের আনুগত্য বরণ করে নেয়। এছাড়া গাতফান গোত্রও মুরতাদ হয়ে যায়। আর হাওয়াযেন গোত্র যাকাত আটকে রাখে। অপরদিকে বনু সুলায়েমের নেতারাও মুরতাদ হয়ে যায়। আর মহানবী (সা.) কর্তৃক নিযুক্ত আমীরগণ ইয়েমেন, ইয়ামামা, বনু আসাদ ও অন্যান্য বিভিন্ন এলাকা ও শহর থেকে ফিরে আসে আর তারা বলে, আরবের ছোট বড় সবাই আনুগত্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। হযরত আবু বকর (রা.) অপেক্ষা করেন যে, উসামা ফিরে আসলে তাদের সাথে যুদ্ধ করা হবে। কিন্তু আবাস ও যুবইয়ানের গোত্রগুলো তাড়াহুড়ো করে এবং মদীনার নিকটবর্তী আবরাক নামক স্থানে এসে শিবির স্থাপন করে। আর অন্যান্য আরও কিছু মানুষ যুল কাস্‌সাতে এসে শিবির স্থাপন করে। তাদের সাথে বনু আসাদের মিত্ররাও ছিল। আর বনু কিনানা থেকেও কিছু লোক তাদের সাথে যোগ দিয়েছিল। তারা সবাই হযরত আবু বকর (রা.)-এর নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ করে এবং দাবি জানায় যে, নামায পর্যন্ত আমরা আপনার নির্দেশ মানতে প্রস্তুত আছি। অর্থাৎ, তারা মদীনার চতুষ্পার্শ্বে সমবেত হয় এবং একথা বলে যে, নামায পর্যন্ত আপনার নির্দেশ মানতে সম্মত আছি, কিন্তু যাকাত প্রদান করতে আমরা সম্মত নই। কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) তাদের এ দাবি প্রত্যাখ্যান করেন। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) লিখেন,

এ উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, সাহাবীরা যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন তারা রাষ্ট্রদ্রোহী ছিল। তারা কর দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল এবং তারা মদীনার ওপর আক্রমণ করেছিল। অর্থাৎ, মদীনার চতুর্দিকে সমবেত হয়েছিল যে, যদি এই দাবি না মানা হয় তবে আমরা আক্রমণ করব। মুসায়লামা তো স্বয়ং মহানবী (সা.) এর জীবদ্দশায়ই তাঁকে (সা.) লিখেছিল যে, আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে, আরবের অর্ধাংশ আমাদের এবং অর্ধাংশ কুরাইশদের। আর মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর সে হাযার ও ইয়ামামা থেকে তাঁর (সা.) নিযুক্তগভর্নর সুমামা বিন উসালকে বহিস্কার করে এবং নিজে সেই অঞ্চলের গভর্নর সেজে বসে। অধিকন্তু সে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করে। অনুরূপভাবে মদীনার দু'জন সাহাবী হাবীব বিন যায়েদ এবং আব্দুল্লাহ্ বিন ওয়াহাবকে সে বন্দি করে এবং জোরপূর্বক তাদেরকে দিয়ে নিজের নবুয়্যতের স্বীকারওক্তি আদায়ের চেষ্টা করে। যেমনটি পূর্বেও বর্ণিত হয়েছে যে, আব্দুল্লাহ্ বিন ওয়াহাব ভীত হয়ে তার কথা মেনে নেয়, কিন্তু হাবীব বিন যায়েদ তার কথা মানতে অস্বীকৃতি জানান। এতে মুসায়লামা তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ কেটে আগুনে জ্বালিয়ে দেয়। অনুরূপভাবে ইয়েমেনেও যারা মহানবী (সা.) কর্তৃক নিযুক্ত কর্মকর্তা ছিলেন, তাদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে বন্দি করা হয় এবং কয়েকজনকে কঠোর শাস্তি প্রদান করা হয়। একইভাবে, তাবারী লিখেছেন, আসওয়াদ আনসীও বিদ্রোহের আগুন প্রজ্বলিত করেছিল এবং মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে যেসব শাসক নিযুক্ত ছিলেন, তাদেরকে সে কষ্ট দিয়েছিল ও তাদের কাছ থেকে যাকাতের সম্পদ ছিনিয়ে নেয়ার নির্দেশ দিয়েছিল।এরপর সে সানা'তে মহানবী (সা.)-এর নিযুক্ত শাসক শাহার বিন বাযানের ওপর আক্রমন করে। অনেক মুসলমানকে হত্যা করে, লুটতরাজ চালায়, গভর্নরকে হত্যা করে এবং তাঁকে হত্যা করার পর তাঁর মুসলমান স্ত্রীকে জোরপূর্বক বিয়ে করে। বনু নাজরানও বিদ্রোহ করে আর তারাও আসওয়াদ আনসীর সাথে যুক্ত হয় এবং তারা দু'জন সাহাবী (অর্থাৎ), আমর বিন হাযম এবং খালিদ বিন সাঈদ (রা.)-কে (তাদের) এলাকা থেকে বহিস্কার করে। এসব ঘটনাথেকে প্রতীয়মান হয় যে, মিথ্যা নবুয়্যতের দাবীদারদের সাথে এ উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করা হয় নি যে, তারা মহানবী (সা.)-এর উম্মতী হওয়া সত্ত্বেও নবী হওয়ার দাবী করেছিল আর মহানবী (সা.)-এর ধর্ম প্রচারকের দাবীদার ছিল বরং সাহাবীরা তাদের সাথে এ কারণে যুদ্ধ করেছিলেন যে, তারা ইসলামী শরীয়তকে রহিত করে নিজেদের (মনগড়া) আইন প্রবর্তন করতো আর এবং (নিজেদেরকে) নিজ এলাকার শাসক বলে দাবি করতো আর শুধুমাত্র নিজ এলাকার শাসক হবার দাবীদারই ছিল না বরং তারা সাহাবীদেরকে হত্যা করে, মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোর ওপর আক্রমন হয়। প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং নিজেদের স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়। তিনি (রা.) লিখেন, এসব ঘটনা সত্ত্বেও মাওলানা মওদুদী সাহেবের এই বক্তব্য যে, মহানবী (সা.)-এর সকল সাহাবী মিথ্যা নবুয়্যতের দাবীদারদের সাথে যুদ্ধ করেন- এটি মিথ্যা নয় তো আর কি? যদি কেউ একথা বলে যে, সম্মানিত সাহাবীরা মানুষ হত্যা বৈধ আখ্যা দিতেন, তাহলে কি এটি কেবল এই কারণে যথার্থ হবে যে, মুসায়লামা কায্‌যাবও মানুষ ছিল আর আসওয়াদ আনসীও মানুষ ছিল! হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, যারাবিকৃতরূপে ইসলামের ইতিহাস উপস্থাপন করে তারা ইসলামের কোনো সেবা করছে না। ইসলামের সেবাই যদি লক্ষ্য হয় তাহলে

তাদের উচিত সত্যকে সর্বাগ্রে স্থান দেয়া আর মিথ্যা বর্ণনা এবং বিভিন্ন ঘটনা বিকৃতরূপে উপস্থাপন করাহতে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা।

মোটকথা, তাদের দমনের মাধ্যমে আরব ভূখণ্ড থেকে বিদ্রোহ সম্পূর্ণরূপে নির্মূল হয়। জনৈক ঐতিহাসিক লিখেছেন, তখন আরবের সকল বিদ্রোহের অবসান ঘটে আর সকল মুরতাদকে দমন করা হয়েছেল। হযরত আবু বকর (রা.) সারা দেশের এই নৈরাজ্যকে যে সুষ্ঠু পরিকল্পনা এবং দ্রুততার সাথে নির্মূল করেন তা তাঁর মহান যোগ্যতার পরিচায়ক এবং স্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হয় যে, কীভাবে প্রতিটি পদক্ষেপে তিনি ঐশী সাহায্য ও সমর্থনপুষ্ট ছিলেন। এক বছরেরও কম সময়ে ধর্মত্যাগের নৈরাজ্য এবং বিদ্রোহকে নির্মূল করা আরব ভূখণ্ডে ইসলামী শাসনব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা ছিল এক বিস্ময়কর কীর্তি। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) ইসলামের বিজয়ে সীমাহীন আনন্দিত ছিলেন কিন্তু সেই আনন্দের মাঝে কোনোরূপ দম্ভ বা অহংকারের নামগন্ধও ছিল না কেননা, তিনি জানতেন; যা কিছু হয়েছে তা কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'লার কৃপা এবং তাঁর অনুগ্রহেই হয়েছে। স্বল্পসংখ্যক মুসলমানের মাধ্যমে সমস্ত আরবের মুরতাদদের যুদ্ধবাজ সেনাদের মোকাবিলা করে (এবং) তাদেরকে পরাজিত করে ইসলামের পতাকা অত্যন্ত মহিমার সাথে পুনরায় সুউচ্চ করা ছিল তাঁর পক্ষে সাধ্যাতীত। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর সামনে তখন একটিই ছিল অর্থাৎ, একত্ববাদী ধর্মের শক্তি সঞ্চার এবং ইসলাম ধর্মকে সফলতার পরম শিখরে পৌঁছানোর জন্য কী কী পদক্ষেপ নেয়া যায়। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের একমাত্র লক্ষ্য ছিল ইসলামের প্রতাপ (প্রতিষ্ঠা) আর এই আকাঙ্খাই প্রতি মুহূর্তে তাঁর মন-মস্তিষ্কে বিরাজ করতো। সকল মুরতাদ বিদ্রোহীকে নির্মূল করার পরসবারই এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে, এখন মহানবী (সা.)-এর খলীফার সম্মুখে কোনো নৈরাজ্যবাদী টিকতে পারবে না কিন্তু সাধারণ লোকদের ন্যায় হযরত আবু বকর (রা.) কোনোরূপ আত্মতুষ্টির বিভ্রমে নিপতিত ছিলেন না। তিনি জানতেন, বর্হিঃশক্তি ধর্মত্যাগ এবং বিদ্রোহের নৈরাজ্যের আন্দোলনকে পুনরায় উস্কে দিয়ে (আরবে) অশান্তি ছড়ানোর কারণ হতে পারে, উক্ত নৈরাজ্য সাময়িকভাবে দমন না হয়ে থাকলে (এমনটি হতে পারে)। ইসলাম-বিরোধী বর্হিঃশক্তিগুলো ছিল বড় বড় ক্ষমতাধর। তারা পুনরায় আরব-সীমান্তে অশান্তি ছড়াতে পারে তাই তিনি (রা.) কোনো প্রকার বিভ্রমে নিপতিত ছিলেন না। আরব গোত্রগুলোর এই প্রত্যাশিত বিশৃঙ্খলাথেকে রক্ষা লাভের জন্য যথোচিত মনে করা হয় যে, আরব গোত্রগুলোর মনোযোগ ইরান এবং সিরিয়ার প্রতি নিবদ্ধ করে দেয়া হোক যাতেরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নৈরাজ্য সৃষ্টির কোনো সুযোগ তাদের না হয়। আর এভাবে মুসলমানরা প্রশান্তি লাভ করে আর তারা পূর্ণ মনোযোগের সাথে ধর্মীয় বিধান পালন করতে পারে। যাহোক, আরব সীমান্তের প্রতিরক্ষা এবং ইসলামী (অধ্যুষিত) রাজত্বকে নিজেদের শক্তিশালী প্রতিপক্ষের হাত থেকে সুরক্ষিত রাখার জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল, এসব শক্তিধর জাতির কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছানো হয় যাতে এসব গোত্র ইসলামের এই বিশ্বজনীন বাণীকে মেনে নিয়ে অথবা অনুধাবন করে নিজেরাও শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে জীবন যাপন করে এবং অন্যরাও যেন তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তির হাত থেকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত থেকে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্মকর্ম পালন করতে পারে। যাহোক, এর জন্য হযরত আবু বকর (রা.) কোনো কোনো রীতি ও কর্মপন্থা অবলম্বন করেছেন সে সম্পর্কে ইতিহাসের গ্রন্থাবলীতে লিখিত আছে যে,

মুরতাদ বিদ্রোহীদের (বিরুদ্ধে পরিচালিত) বিভিন্ন যুদ্ধাভিযান শেষ হওয়ার পর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) ভবিষ্যতের করণীয় সম্পর্কে চিন্তাভাবনায় মগ্ন ছিলেন অর্থাৎ, আরব এবং ইসলামের পুরোনো শত্রু; ইরান এবং রোমান সাম্রাজ্যের পক্ষ থেকে স্থায়ীভাবে জন্য সুরক্ষিত থাকতে হলে কী কী কর্মপন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। কেননা, মহানবী (সা.)-এর পবিত্র জীবদ্দশাতেও এই দুটি পরাশক্তি আরবকে নিজেদের অধীনস্থ রাখতে চাইতো আর মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পরও যখন অনেক অঞ্চল এবং গোত্রের ধর্মত্যাগ ও বিদ্রোহের আগুন মদীনা রাষ্ট্রকে নিজের করায়ত্বে নিয়েছিল তখন কোনো কোনো স্থানে এর পেছনে এসব পরাশক্তিরও একটি হাত (কার্যকর) ছিল এবং একে সুবর্ণসুযোগ মনে করে হিরাকেলের সৈন্য সিরিয়ায় এবং ইরানের সৈন্যরা ইরাকে সমবেত হতে আরম্ভ করে। হযরত আবু বকর (রা.) যিনি মহানবী (সা.)-এর পবিত্র নির্দেশনা বাস্তবায়নকল্পে সর্বপ্রথম হযরত উসামার নেতৃত্বে রোমানদের বিরুদ্ধে প্রথম সেনাদল প্রেরণ করেছিলেন, তিনি এসব সন্ত্রাসী এবং স্বৈরাচারী অপশক্তি সম্পর্কে নির্ভয়ে ও নিশ্চিন্তে থাকতে পারতেন– তা অসম্ভব ছিল। কিন্তু তিনি (রা.) সবার সামনে কোনো কর্মপন্থা উপস্থাপন করার পূর্বেই সংবাদ পান যে, হযরত মুসান্নাহ্ বিন হারেসা (রা.) যিনি বাহরাইনে মুরতাদ বিদ্রোহীদের বিদ্রোহ দমনে সাহায্য করেছিলেন, তিনি তার সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে নিয়ে পারস্য উপসাগরের তীর ঘেঁষে উত্তরের দিকে ইরাকের পথে অভিযান শুরু করে দিয়েছেন। পরিশেষে তিনি সেসব আরব গোত্রগুলোর কাছে পৌঁছেন যারা দজলা এবং ফুরাতের (ডেলটাই) বদ্বীপ অঞ্চলে বসবাস করত। হযরত মুসান্নাহ্ বিন হারেসা (রা.) বাহরাইনের একটি গোত্র বকর বিন ওয়ায়েলের সদস্য ছিলেন।

বাহরাইনের অঞ্চলটি ইয়ামামা এবং পারস্য উপসাগরের মাঝখানে অবস্থিত ছিল আর তাতে বর্তমান কাতার এবং বাহরাইনের শাসনাধীন দ্বীপগুলোও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর রাজধানী ছিল দারীন। যাহোক, হযরত মুসান্নাহ বিন হারেসা (রা.) হযরত আলা বিন হাযরামী (রা.)-এর সাথে মিলিত হয়ে বিদ্রোহীদের সাথেও যুদ্ধ করেছিলেন। আর বাহরাইন ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় যারা ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল আর যারা ইসলামী সৈন্যদের সাথে মিলিত হয়ে বিদ্রোহীদের (বিরুদ্ধে) যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, হযরত মুসান্নাহ (রা.) তাদের নেতা ছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) তখনও ভবিষ্যতের করণীয় সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বেই হযরত মুসান্নাহ (রা.) স্বয়ং মদীনায় চলে আসেন এবং হযরত আবু বকর (রা.)-কে ইরাকের (চলমান) অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করেন যে, যেসব আরব গোত্র দজলা এবং ফুরাতের বদ্বীপ অঞ্চলে বসবাস করছে তারা সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দাদের হাতে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে এবং তাদেরকে কষ্ট দেওয়া হচ্ছে। আরবের (অধিবাসীরা) বেশিরভাগ কৃষিকাজ করে থাকে আর যখন শষ্য পরিপক্ক হয় তখন স্থানীয় বাসিন্দারা তা লুটে নেয়। তাই, হযরত মুসান্নাহ্ বিন হারেসা (রা.) নিবেদন করেন, ইসলামী সৈন্য প্রেরণ করে সেসব লোককে বিপদাপদ থেকে মুক্ত করা হোক। হযরত আবু বকর (রা.) মদীনার পরামর্শক সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করেন এবং হযরত মুসান্নাহ্ বিন হারেসা (রা.)-এর প্রস্তাব (তাদের) সম্মুখে পেশ করেন। মদীনার লোকজন যেহেতু ইরাকের পরিস্থিতি সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন, তাই পরামর্শ দেন, হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদকে ডেকে এনে পুরো বিষয় তার সামনে উপস্থাপন করা হোক; তার কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া হোক। হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.) সেই দিনগুলোতে ইয়ামামায় অবস্থান করছিলেন, তাই হযরত আবু বকর (রা.) তাকে মদীনায় ডেকে আনান। হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ মদীনায় পৌঁছালে হযরত আবু বকর (রা.) যখন ইরাকে সেনা অভিযান পরিচালনা সংক্রান্ত হযরত মুসান্নার প্রস্তাব তার সামনে উপস্থাপন করেন, তখন হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদেরও এই ধারণা ছিল যে, হযরত মুসান্না ইরাক-সীমান্তে ইরানীদের বিরুদ্ধে যে কার্যক্রম আরম্ভ করেছেন, আল্লাহ্ না করুন- তা যদি ব্যর্থ হয় এবং হযরত মুসান্নার বাহিনীকে আরবের দিকে পিছু হটতে হয়– তাহলে ইরানী শাসকবর্গ আরও ধৃষ্ট হয়ে উঠবে। তারা কেবল হযরত মুসান্নার বাহিনীকে ইরাকের সীমান্ত থেকে তাড়িয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হবে না, বরং বাহরাইন ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে পুনরায় তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার এবং একচ্ছত্র শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠারও চেষ্টা করবে। আর এমন পরিস্থিতিতে ইসলামী সাম্রাজ্যের জন্য শঙ্কা দেখা দিবে। তাই তিনিও বলেন, সেই শঙ্কা থেকে বাঁচার জন্য সকল প্রকার সাহায্য পাঠানো হোক; হযরত মুসান্নার কাছে সেখানে সেনাদল পাঠানো হোক এবং ইরানীদেরকে আরব সীমান্তে প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার (সুযোগ দেয়ার) পরিবর্তে আরও পিছু হটতে বাধ্য করা হোক যাতে তাদের পক্ষ থেকে ভবিষ্যতে কখনও আরবের জন্য কোনো শঙ্কা বাকি না থাকে। হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.) তার এই মতামত উপস্থাপন করেন। তার এই মতামত শুনে অন্যান্য সাহাবীরাও হযরত মুসান্নার প্রস্তাবগুলো মেনে নেন আর হযরত আবু বকর (রা.) হযরত মুসান্নাকে সেসব লোকের নেতা মনোনীত করেন যাদেরকে সাথে নিয়ে তিনি ইরাক সীমান্তে অগ্রাভিযান পরিচালনা করেছিলেন এবং নির্দেশ দেন, আপাততঃ সেখানকার আরবের বিভিন্ন গোত্রকে সাথে যুক্ত করার এবং ইসলামগ্রহণে সম্মত করার চেষ্টা করুন। একইসাথে একথাও বলেন, শীঘ্রই মদীনা থেকেও একটি সেনাদল তাদের সাহায্যার্থে প্রেরণ করা হবে যাদের সাহায্যে তিনি আরও অধিক সেনাভিযান পরিচালনা অব্যাহত রাখতে পারবেন।

কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মত হল, হযরত মুসান্না সাহায্যের আবেদন জানাতে আদৌ মদীনায় যান নি, কিংবা হযরত আবু বকর (রা.)-এর সাথে তার সাক্ষাতও হয় নি, বরং তিনি তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে বদ্বীপ অঞ্চলে অগ্রসর হয়ে (সেনাভিযান পরিচালনা) করতে করতে অনেক দূর পর্যন্ত চলে যান এবং সামনে গিয়ে (তাকে) ইরানী সেনাপতি হুরমুযের সেনাদলের মুখোমুখি হতে হয়। হুরমুয তখন সীমান্ত বাহিনীর প্রধান ছিল এবং কিসরার দরবারে কোনো ব্যক্তি সর্বোচ্চ যে পদমর্যাদা লাভ করতে পারতো- হুরমুয তাদেরই একজন ছিল। হুরমুয ও মুসান্নার মাঝে তখনও যুদ্ধ চলমান ছিল– এমতাবস্থায় হযরত আবু বকর (রা.) এসব ঘটনার সংবাদ জানতে পারেন। তিনি তখন পর্যন্ত মুসান্নার নাম সম্পর্কে একেবারেই অনবহিত ছিলেন। এসব সংবাদ পৌঁছার পরে যখন তিনি সত্যাসত্য যাচাই করেন তখন জানতে পারেন, মুসান্না ধর্মত্যাগ ও বিদ্রোহ দমনের যুদ্ধকালে বাহরাইনের ভেতর অসংখ্য উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম সম্পাদন করেছেন। হযরত আবু বকর (রা.) তখন হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদকে নির্দেশ দেন, তিনি যেন হযরত মুসান্নার সাহায্যার্থে একটি বাহিনী নিয়ে ইরাক গমন করেন এবং হুরমুযকে পরাজিত করে হীরা অভিমুখে যাত্রা করেন। হীরাও কূফা থেকে তিন মাইল দূরত্বে অবস্থিত একটি শহর। যাহোক, একইসাথে তিনি (রা.) হযরত আইয়ায বিন গানামকে নির্দেশ দেন, তিনি যেন দুমাতুল জন্দলে যান; [দুমাতুল জন্দল সিরিয়া ও মদীনার মধ্যবর্তী একটি দুর্গ ও বসতির (নাম), যা মদীনা থেকে তৎকালীন ভ্রমণের প্রচলিত

রীতি অনুযায়ী পনের-ষোল দিনের দূরত্বে অবস্থিত ছিল।] আর (সেখানে গিয়ে) সেখানকার বিদ্রোহী ও মুরতাদ বাসিন্দাদের বশ্যতা স্বীকার করিয়ে হীরা চলে যান। হযরত আইয়ায বিন গানাম (রা.) মহানবী (সা.)-এর সাহাবী ছিলেন। তিনি হুদাইবিয়ার সন্ধির পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং তাতে অংশগ্রহণও করেছিলেন। হযরত আবু উবায়দা নিজের মৃত্যুর সময় তাকে সিরিয়ায় নিজের স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে গিয়েছিলেন। হযরত উমর (রা.) তাকে সেই পদে বহাল রাখেন এবং বলেন, আমি সেই আমীরকে পরিবর্তন করব না যাকে হযরত আবু উবায়দা আমীর নিযুক্ত করেছেন।

যাহোক, হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ ও হযরত আইয়ায বিন গানামের মধ্যে যিনি প্রথমে হীরা পৌঁছবেন, তিনি-ই উক্ত অঞ্চলে সামরিক অভিযান পরিচালনাকারী সৈন্যদলের নেতৃত্ব লাভ করবেন। এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) যখন ইয়ামামায় দায়িত্ব পালন সম্পন্ন করেন তখন হযরত আবু বকর (রা.) তাকে লিখেন, ফাজ্জুল হিন্দ তথা আবুল্লাহ্ থেকে শুরু করুন এবং ইরাকের উপরাঞ্চল বা পর্বতাঞ্চল দিয়ে ইরাকে যান আর লোকদেরকে নিজের সাথে যুক্ত করুন এবং তাদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে (তথা ইসলামের) আহ্বান জানান। তারা গ্রহণ করলে ভাল অন্যথায় তাদের কাছ থেকে জিযিয়া বা কর গ্রহণ করুন, কিন্তু তারা যদি কর দিতেও অস্বীকার করে তাহলে তাদের সাথে যুদ্ধ করুন। আরও নির্দেশ দেন, কাউকে নিজের সাথে যুদ্ধের জন্য যেতে বাধ্য করবেন না আর ইসলাম থেকে মুরতাদ হয়ে যাওয়া কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণ করবেন না এমনকি সে যদি পরবর্তীতে ইসলামে ফিরে আসে তবুও আর যে মুসলমানের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবেন, তাকে নিজের সাথে যুক্ত করে নিন। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) হযরত খালিদের সাহায্যার্থে সেনাদল প্রস্তুত করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ ইয়ামামা থেকে ইরাক অভিমুখে যাত্রার প্রাক্কালে নিজের সেনাদলকে তিন ভাগে বিভক্ত করেন এবং সবাইকে একই পথ দিয়ে প্রেরণ করেন নি বরং হযরত মুসান্না (রা.)-কে স্বীয় যাত্রার দু'দিন পূর্বে প্রেরণ করেন। এরপর আদী বিন হাতেম এবং আসেম বিন আমরকে একদিন বিরতি দিয়ে প্রেরণ করেন, সবশেষে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ স্বয়ং যাত্রা করেন। তাদের সবার সাথে হাফীরে সমবেত হওয়ার অঙ্গীকার করেন যেন সেখান থেকে সম্মিলিতভাবে শত্রুর ওপর আক্রমন করতে পারেন। হাফীর বসরা থেকে মক্কা অভিমুখে যাত্রাপথে প্রথম মঞ্জিল (বিরতিরস্থান)। আর এটি লেখা আছে যে, এই সীমান্তটি পারস্যের সকল সীমান্তের মধ্যে শান ও শওকত বা জাঁক-জমকের দিক দিয়ে সবচেয়ে বৃহৎ এবং সুদৃঢ় সীমান্ত ছিল আর এর শাসক ছিল হুরমুয। এখানকার সেনাপতি এক দিকে স্থলভাগে আরবদের সাথে যুদ্ধ করতো আর (অপরদিকে) সমুদ্রপথে হিন্দের অধিবাসীদের সাথে। যাহোক, হযরত খালিদ (রা.)-এর সৈন্য সংখ্যা খুবই নগণ্য ছিল কেননা, প্রথমতঃ তাদের বৃহদাংশ ইয়ামামার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল আর দ্বিতীয়তঃ হযরত আবু বকর (রা.) তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, যদি কেউ ইরাক যেতে না চায় তাহলে তার ওপর বলপ্রয়োগ করবে না এর পাশাপাশি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণনির্দেশ এটিও দিয়েছিলেন যে, এ ছাড়া কোনো প্রাক্তন মুরতাদকে, যদিও সে পরবর্তীতে ইসলাম কবুল করুক না কেন, খলীফার কাছ থেকে বিশেষভাবে অনুমতি গ্রহণ না করা পর্যন্ত ইসলামী সৈন্যদলে (তাদের) যুক্ত করবে না। হযরত খালিদ হযরত আবু বকর (রা.)-এর কাছে আরও সাহায্যকারী সৈন্যদল প্রেরণের জন্য (পত্র) লিখলে তিনি তাকে সাহায্য করার জন্য কেবল একজনকে অর্থাৎ, কা'কা বিন আমরকে প্রেরণ করেন। লোকেরা (এতে) খুবই অবাক হয় এবং তারা নিবেদন করেন, আপনি খালিদের সাহায্যার্থে কেবল একজনকে পাঠাচ্ছেন অথচ বাহিনীর বৃহদাংশ এখন তার থেকে পৃথক হয়ে গেছে। হযরত আবু বকর (রা.) উত্তরে বলেন, যে সেনাদলে কা'কার মতো ব্যক্তি যুক্ত হয়তারা কখনও পরাজিত হতে পারে না। তদুপরি কা'কার হাতে তিনি হযরত খালিদকে একটি পত্র প্রেরণ করেন, যাতে লিখেন; তিনি যেন ঐসব লোককে নিজ সেনাদলে যোগদানে অনুপ্রাণিত করেন যারা মহানবী (সা.)-এর (মৃত্যুর) পরেও যথারীতি ইসলামে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন আর যারা মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। এই পত্র পাওয়ার পর হযরত খালিদ নিজ সৈন্যদলকে বিন্যস্ত করতে আরম্ভ করেন।

ইরাকের কৃষকদের বিষয়ে হযরত আবু বকর (রা.) যে নির্দেশনা দিয়েছিলেন এবং যে কর্মপন্থা ছিল, এ সম্পর্কে লেখা আছে যে, আরবরা ইরাকের ভূখণ্ডে কৃষিকাজ করতো। ফসল কাটা হলে তারা এর খুব সামান্য অংশ ভাগে পেত। অধিকাংশ (শস্য) ঐসব ইরানী গৃহস্তের কাছে চলে যেত যারা ঐসব জমির মালিক ছিল। এই জমির মালিকরা দরিদ্র আরবদের ওপর সীমাহীন অত্যাচার চালাতো এবং তাদের সাথে ক্রীতদাসের চেয়ে জঘন্য দুর্ব্যবহার করত। হযরত আবু বকর (রা.) ইরাকে নিজ সেনাপতিদেরকে নির্দেশ দেন যে, যুদ্ধের সময় ঐসব কৃষকদের যেন কোনোরূপ কষ্ট দেয়া না হয় আর তাদেরকে (যেন) হত্যা করাও না হয় এমনকি বন্দি বানানোও না হয়। মোটকথা, তাদের সাথে কোনোরূপ দুর্ব্যবহার যেন না করা হয় কেননা, তারাও তাদের মতোই আরব আর ইরানীদের অত্যাচারের যাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছে। তাদের এ বিষয়ে আশ্বস্ত করা উচিত যে, এখানে আরবদের

শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের নির্যাতিত জীবনের অবসান ঘটবে। আর তখন তারা তাদের স্বজাতির লোকদের কল্যাণে সত্যিকার ন্যায়বিচার, প্রাপ্য স্বাধীনতা, সাম্যের ভাগিদার হতে পারবে। হযরত আবু বকর (রা.)-এর এই প্রজ্ঞাপূর্ণকর্ম মুসলমানদের অফুরন্ত কল্যাণে ধন্য করে। তাদের বিজয়ের পথে সহজসাধ্যতা সুগম হয় আর তাদের এই আশংকা থাকে না যে, অগ্রাভিযান পরিচালনার সময় পাছে কোথাও পেছন থেকে আক্রমনের শিকার হয়ে তাদের রাস্তা (আবার) বন্ধ না হয়ে যায়। হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.) যখন লিবাজ-এ শিবির স্থাপন করেন তখন হযরত মুসান্না তার সেনাদলের সাথে খাফ্‌ফান-এ অবস্থান করছিলেন। লিবাজ হচ্ছে, বসরা ও ইয়ামামার মধ্যবর্তী একটি স্থান। আর খাফ্‌ফান হচ্ছে, কূফার নিকটবর্তী একটি জায়গা। হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ, হযরত মুসান্নাকে একটি পত্র লিখেন যেন তিনি তার কাছে আসেন। আর এর সাথে হযরত আবু বকর (রা.)-এর সেই পত্রও প্রেরণ করেন, যাতে হযরত আবু বকর (রা.) হযরত মুসান্না বিন হারেসাকে হযরত খালিদের আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

এগুলো সবই তারীখে তাবারীর রেওয়ায়েত। পূর্বে তিনি ছিলেন, এরপর হযরত খালিদকে স্বয়ং হযরত আবু বকর (রা.) প্রেরণ করেন। যাহোক, এরপর বিভিন্ন যুদ্ধ হয়। কোনো কোনো যুদ্ধ হয়েছে সেগুলোর নাম কী ছিল? ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে এগুলো বিজয়ের উল্লেখকরা হবে। হযরত আবু বকর (রা.)-এর খেলাফতকালে মুসলমানেরা ইরানীদের বিরুদ্ধে ইরাকের অঞ্চলে এসব যুদ্ধ করেছে আর তাতে যেসব বিজয় আল্লাহ্ তা'লা দান করেছেন তা (আগামীতে) উল্লেখ করা হবে, ইনশাআল্লাহ্। *(সূত্র: কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)*

সত্যের বাণী প্রচার করা আবশ্যক

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন,

আল্লাহ্ তা'লা সৃষ্টির সূচনাতেও বলেছিলেন যে, আমি তোমার প্রভু। ঠিক তেমনই শেষ যুগেও তিনি বলেন, 'আনাল মওজুদ' (তথা আমি সদা বিরাজমান)। স্মরণ রেখ! তিনি পথ-প্রদর্শক। তিনি যদি লক্ষ্য না রাখেন তাহলে সবাই নাস্তিক হয়ে যাবে। তাই তিনি নিজ অস্তিত্বের প্রমাণ দিতে থাকেন আর বর্তমান যুগে তো এ বিষয়টি বিশেষভাবে আবশ্যক। যে জিনিসের রাজত্ব থাকে তার প্রভাব প্রকাশ পেয়ে যায়। আজকাল যদি পুণ্যবান ব্যক্তি, যিনি সত্য ও সঠিক পথ লাভ করেছেন, তিনি যদি ভ্রান্তির বিরুদ্ধে প্রভাব বিস্তার করতে না পারেন তাহলে বুঝা গেল, অন্ধকার বা ভ্রষ্টতার রাজত্ব এখনও বিদ্যমান। যখন এমন আবহ চলে তখন সবাই এর প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে যায় এবং মু'মিন নিজে রক্ষা পেলেও অন্যদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। ভ্রষ্টতার প্রতাপ এত বেশি যে, যারা বড় বড় শিক্ষিত লোক, তাদের সাথে কেউ ধর্মীয় বিষয়ে আলোচনা করতে সাহস পায় না পাছে সে অসন্তুষ্ট হয় অথবা আমাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে। কিন্তু সাহাবীদের (রা.) আদর্শ দেখা প্রয়োজন অর্থাৎ ইসলামের দুর্বলতম অবস্থাতেও মহানবী (সা.) সমস্ত রাজা-বাদশাহ্‌দের কাছে ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত পত্র প্রেরণ করেছেন। তখন এতটা সভ্য বা সুশীল যুগও ছিল না আর নিরাপদও ছিল না। সাহাবীরা (রা.) ঐসকল পত্র সরবরাহ করেছেন এবং নিজেদের বিশ্বাস রাজ দরবারে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। একজন খ্রিষ্টান বাদশাহ্ যখন ইসলামের দাওয়াতসংবলিত পত্র পেলেন এবং সাহাবীদের (রা.) মুখ থেকে ঐশী বাণী শুনলেন তখন অবলীলায় বলে উঠলেন, আপনাদের বাণী শুনে মনে হচ্ছে, যে মহান সত্তা তওরাত অবতীর্ণ করেছেন, এটি তাঁরই বাণী এবং তিনি আরও বলেন, আমি যদি সেই নবীর কাছে যেতে পারতাম তবে তাঁর (সা.) পদচুম্বন করতাম। পাদ্রীদের ডেকে বলেন, দেখো! ইসলাম কত উন্নতমানের ধর্ম, তোমাদের কাছে এই ধর্ম কি পছন্দনীয়? পাদ্রীদের পক্ষ থেকে তিনি যখন বিরোধিতা অনুভব করলেন তখন বললেন, আমি তো তোমাদেরকে পরীক্ষা করছিলাম। তার এই দুর্বলতা ছিল জাগতিকতার মোহের প্রতিফল। যেব্যক্তি জগৎপূজারি নয় সে সত্য বলতে এবং সত্যের বাণী প্রচার করতে ভয় পায় না আর আল্লাহ্ স্বয়ং তাকে সাহায্য করেন। (মালফুযাত, দশম খণ্ড, পৃ. ১১৮)

২২ জুলাই, ২০২২ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডে অবস্থিত মুবারক মসজিদে প্রদত্ত

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর জুমুআর খুতবা

বিষয়:
হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর স্মৃতিচারণ

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

যেমনটি গত খুতবায় আমি বলেছিলাম, আজ হযরত আবু বকর (রা.)-এর খেলাফতকালে ইরানীদের বিরুদ্ধে (পরিচালিত) বিভিন্ন অভিযানের উল্লেখ করা হবে। এ ধারাবাহিকতায় সংঘটিত একটি যুদ্ধ হল এটিকে যাতুস্ সালাসিল (তথা শিকলের যুদ্ধ) বা কাযেমার যুদ্ধ বলা হয়। দ্বাদশ হিজরীর মহররম মাসে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধটি তিনটি নামে সুপরিচিত। প্রধানত সালাসিলের যুদ্ধ, কাযেমার যুদ্ধ এবং হাফীফের যুদ্ধ। এই যুদ্ধকে যাতুস্ সালাসিল অর্থাৎ, শিকলের যুদ্ধ বলার কারণ হল, আরবী ভাষায় সিলসিলা বা শিকলের বহুবচন হচ্ছে সালাসিল। কেননা এই যুদ্ধে ইরানী সেনাবাহিনী পরস্পর পরস্পরকে শিকলাবদ্ধ করে নিয়েছিল যাতে কেউ যুদ্ধ থেকে পালাতে না পারে। (তবে) কোনো কোনো ঐতিহাসিক সালাসিলের যুদ্ধের এই রেওয়ায়েতকে গ্রহণ করেন নি। মুসলমান ও ইরানীদের মাঝে 'কাযেমা' নামক জায়গার নিকটে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তাই একে কাযেমার যুদ্ধ নামেও আখ্যায়িত করা হয়। বসরা থেকে বাহরাইন যাওয়ার পথিমধ্যে সমুদ্র তীরের একটি বসতি হল, কাযেমা। হাফীর অঞ্চলে সংঘটিত হওয়ার কারণে এই যুদ্ধকে হাফীরের যুদ্ধও বলা হয়। এই যুদ্ধে মুসলমানদের সেনাপতি ছিলেন

হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা.)। আর ইরানী সেনাপ্রধানের নাম ছিল হুরমুয। মুসলমাদের সৈন্যসংখ্যা ছিল আঠারো হাজার। যেমনটি পূর্ববর্তী বিভিন্ন খুতবায় বর্ণিত হয়েছিল, ইরানীদের পক্ষ থেকে হুরমুয অত্রাঞ্চলের শাসক ছিল। বংশমর্যাদা এবং সম্মান ও সম্ভ্রমের দিক থেকে অধিকাংশ ইরানী শাসকের তুলনায় সে এগিয়ে ছিল। সম্ভ্রান্ত ইরানীদের রীতি ছিল তারা সাধারণ টুপির পরিবর্তে মূল্যবান টুপি পরিধান করতো, আর বংশমর্যাদা ও মান-সম্মানের নিরিখে যে ব্যক্তি যেমন মর্যাদার হতো সে অনুসারে মূল্যবান টুপি পরিধান করতো। কথিত আছে, সবচেয়ে মূল্যবান টুপি ছিল এক লক্ষ দিরহামের, যা সেই ব্যক্তিই পরিধান করতে পারতো যে সম্মান ও মর্যাদা এবং প্রভাব-প্রতিপত্তিতে সর্বোচ্চ মানে উপনীত থাকত। আর এদিক থেকেও হুরমুযের পদমর্যাদার কথা অনুমান করা যায় যে, তার টুপির মূল্যও এক লক্ষ দিরহাম ছিল। ইরানীদের দৃষ্টিতে তার পদমর্যাদা স্বীকৃত ছিল ঠিকই কিন্তু ইরাক সীমান্তে বসবাসকারী আরবদের মাঝে তাকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা হত। কেননা সে এসব আরবের ওপর সকল সীমান্তবর্তী (অঞ্চলের) শাসকের চেয়ে বেশি নিপীড়ন ও নির্যাতন চালাত। এসব অমুসলমান আরবদের ঘৃণা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, তারা কারও নোংরামীর উল্লেখ করতে গিয়ে প্রবাদ হিসেবে হুরমুযের নাম উল্লেখ করত। যেমন, (তারা) বলত, অমুক ব্যক্তি তো হুরমুযের চেয়েও বেশি নিকৃষ্ট, অমুক তো হুরমুযের চেয়েও বেশি নোংরা প্রকৃতির এবং নোংরা স্বভাবের। অমুক ব্যক্তি তো হুরমুযের চেয়েও বেশি অকৃতজ্ঞ। এ কারণেই হুরমুযকে প্রায়ই আরবদের (চোরাগোপ্তা) হামলার শিকার হতে হতো। অপরদিকে হিন্দুস্থানের জলদস্যুদের পক্ষ থেকেও হুরমুযকে আক্রমণের মুখোমুখি হতে হতো। যাহোক, হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা.) ইয়ামামা থেকে যাত্রা করার পূর্বে হুরমুযকে পত্র লিখেছিলেন। তিনি তার পত্রে লিখেন, পরসমাচার! আনুগত্য স্বীকার করো, তাহলে নিরাপদ থাকবে। অথবা নিজের ও স্বজাতির জন্য নিরাপত্তার নিশ্চয়তা নিয়ে নাও এবং জিযিয়া বা কর দিতে সম্মত হও, নতুবা তুমি নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকে পরিণতির জন্য দায়ী করতে পারবে না। আমি তোমার মোকাবিলা করার জন্য এমন জাতি নিয়ে এসেছি যারা মৃত্যুকে সেভাবে ভালবাসে যেভাবে তোমরা জীবনকে ভালবাস। হযরত খালেদ (রা.)-এর পত্র যখন হুরমুযের কাছে পৌঁছে তখন সে পারস্য সম্রাট আর্দশীরকে এর সংবাদ দেয় এবং নিজের সেনাদল জড়ো করে, আর একটি দ্রুতগামী সেনা বহর নিয়ে ত্বড়িৎ হযরত খালেদকে মোকাবিলা করার জন্য কাযেমা পৌঁছায়। সে নিজ অশ্বারোহীদের চেয়ে সম্মুখে এগিয়ে যায় কিন্তু সে সেই পথে হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদকে (দেখতে) পায় নি। (ইতোমধ্যে) সে সংবাদ পায় যে, মুসলমানদের সেনাদল হাফীরে সমবেত হচ্ছে; তাই সে ফিরে হাফীরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। বসরা থেকে মক্কা যাওয়ার পথে প্রথম মঞ্জিল ছিল হাফীর। সেখানে পৌঁছেই নিজের সেনাদলের সারিবিন্যাস করে। হুরমুয নিজের ডানে-বামে দুভাইকে নিযুক্ত করে। তাদের মধ্যে একজনের নাম কুবায এবং অন্যজনের নাম ছিল অনুশেজান। ইরানীরা স্বয়ং নিজেদেরকে শিকলাবদ্ধ করে নিয়েছিল। এই রেওয়ায়েতে এমনটিই বর্ণিত হয়েছে আর এটিও বলা হয় যে, তখন সেসব মানুষ যাদের মতামত এর বিরোধী ছিল তারা এমন দৃশ্য দেখে বললো, শত্রুর জন্য তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে শিকলাবদ্ধ করে নিয়েছ, এমনটি করো না। এটি অশনি সংকেত। যারা শিকলাবদ্ধ হওয়ার পক্ষে ছিল, তারা প্রত্যুত্তরে বলে, তোমাদের সম্পর্কে আমরা খবর পেয়েছি যে, তোমরা পলায়নের ইচ্ছা রাখো। হযরত খালেদ (রা.) যখন হুরমুযের হাফীরে পৌঁছার সংবাদ পান তখন তিনি তার সেনাবাহিনী নিয়ে কাযেমার দিকে পথ পরিবর্তন করে নেন। হুরমুয এ সংবাদ পেয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ কাযেমা অভিমুখে যাত্রা করে এবং সেখানে (গিয়ে) শিবির স্থাপন করে। হুরমুয ও তার সেনাবাহিনী যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে আর পানি তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ যখন পৌঁছেন তখন তাকে এমন স্থানে শিবির স্থাপন করতে হয়, যেখানে পানি ছিল না। লোকজন তার কাছে এ সম্পর্কে অভিযোগ করে। তার ঘোষক ঘোষণা দেয় যে, সবাই (বাহন থেকে) নেমে আসুন আর মালপত্র নীচে নামিয়ে আনুন এবং পানির জন্য শত্রুর সাথে লড়াই করুন। কেননা খোদর কসম! পানির ওপর তাদেরই নিয়ন্ত্রণ থাকবে, দুপক্ষের মাঝে যারা সবচেয়ে বেশি অবিচল থাকবে এবং উভয় সেনাদলের মাঝে বেশি সম্মানিত। এই (ঘোষণার) পর মালপত্র নীচে নামিয়ে আনা হয়। বাহনে আরোহিত সৈন্যরা নিজেদের স্থানে অবিচল থাকে আর পদাতিক বাহিনী অগ্রসর হয় এবং শত্রুদের ওপর আক্রমণ করে। উভয়পক্ষের মধ্যে লড়াই শুরু হলে আল্লাহ্ তা'লা একখণ্ড মেঘ প্রেরণ করেন। মুসলমান সারির পেছনে বৃষ্টি হয়, এতে মুসলমানদের অবস্থান দৃঢ় হয়। হুরমুয হযরত খালেদের জন্য একটি ফন্দি আঁটে। সে তার রক্ষীবাহিনীকে বলে, আমি হযরত খালেদকে মোকাবিলার আহ্বান জানাবো, আমি তাকে আমার সাথে ব্যস্ত রাখব (আর) তোমরা চুপিসারে অকস্মাৎ খালেদের ওপর আক্রমণ করবে। এরপর হুরমুয যুদ্ধক্ষেত্রে নেমে আসে, হযরত খালেদ তার ঘোড়া থেকে নেমে আসেন; হুরমুযও তার ঘোড়া থেকে নেমে আসে আর সে হযরত খালেদকে লড়াইয়ের জন্য আহ্বান জানায়। হযরত

খালেদ পায়ে হেঁটে তার কাছে আসেন আর উভয়ের মধ্যে লড়াই হয়। উভয়ের পক্ষ আঘাত হানতে থাকে। হযরত খালেদ হুরমুযকে চেপে ধরে। তখন হুরমুযের রক্ষীবাহিনী বিশ্বাসঘাতকতা করে হযরত খালেদের ওপর আক্রমণ করে এবং তাকে ঘিরে ফেলে। একক যুদ্ধে অন্যরা আক্রমণ করে না। কিন্তু যাহোক হুরমুযের সেনারা খালেদের ওপর আক্রমণ করে বসে। এতদসত্ত্বেও হযরত খালেদ হুরমুযের ভবলীলা সাঙ্গ করে দেন। ইরানীদের এরূপ বিশ্বাসঘাতকতা দেখামাত্রই হযরত কা'কা বিন আমর হুরমুযের রক্ষীবাহিনীর ওপর আক্রমণ করেন আর তাদেরকে ঘিরে ফেলে চিরনিদ্রায় শুইয়ে দেন। ইরানীরা মারাত্মকভাবে পরাজিত হয় এবং পালিয়ে যায়। পলায়নকারীদের মধ্যে কুবায এবং অনুশেজানও ছিল। মুসলমানরা রাতের অন্ধকারে ইরানীদের পশ্চাদ্ধাবন করে আর ফুরাত নদীর বড় সেতু পর্যন্ত তাদের হত্যা করতে থাকে যেখানে বর্তমানে বসরার বসতি গড়ে উঠেছে। যুদ্ধ শেষ হলে হযরত খালেদ (রা.) মালে গনিমত জড়ো করান। এর মধ্যে একটি উটের বোঝার সমপরিমাণ শিকলও ছিল। যার ওজন এক হাজার রাতল ছিল। অর্থাৎ, শিকলের ওজন ছিল প্রায় তিনশ' পঁচাত্তর কেজি। যেসব গনিমতের মাল হযরত আবু বকর (রা.)-এর নিকট প্রেরণ করা হয় তাতে হুরমুযের একটি টুপিও ছিল। যার মূল্য এক লক্ষ দিরহাম ছিল আর তা মূল্যবান মণিমুক্তায় খচিত ছিল।

হযরত আবু বকর (রা.) এই টুপিটি হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-কে দিয়ে দিয়েছিলেন। হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা.) বিজয়ের সুসংবাদ, মালে গনিমত তথা যুদ্ধলব্ধ সম্পদের খুমুস বা এক-পঞ্চমাংশ এবং একটি হাতি মদীনার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন আর ইসলামী সেনাবাহিনীর বিজয়ের সংবাদ তিনি (রা.) সবদিকে ঘোষণা করিয়ে দেন। যির বিন কুলায়েব (রা.) যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ এবং হাতি নিয়ে মদীনায় পৌঁছেন। মদীনাবাসীর ইতঃপূর্বে কখনও হাতি দেখার সুযোগ হয় নি। কেবল মদীনাবাসীই নয় আরবের অন্য কোনো অধিবাসীও তখন পর্যন্ত আবরার হাতিগুলো ছাড়া হাতির চেহারাও দেখে নি। লোকদেরকে দেখানোর জন্য একে শহরজুড়ে ঘুরানো হলে বৃদ্ধ এক মহিলা এই হাতিটি দেখে খুবই বিস্মিত হয়ে বলে, আমরা যা দেখছি তাও কি আল্লাহ্ তা'লার কোনো সৃষ্টি? তারা মনে করছিল, এটি হয়তো কোনো কৃত্রিম জিনিস। হযরত আবু বকর (রা.) যিরের হাতেই এই হাতিকে হযরত খালেদ (রা.)-এর কাছে ফেরৎ পাঠিয়ে দেন। এই যুদ্ধে বিজয় লাভের একটি বড় কারণ ছিল হযরত আবু বকর (রা.)-এর সেই কর্মপন্থা যা তিনি ইরাকের কৃষকদের জন্য গ্রহণ করেছিলেন আর হযরত খালেদ (রা.) কঠোরভাবে এর অনুসরণ করেছিলেন। এই কর্মপন্থার অধীনে তিনি (রা.) কৃষকদের প্রতি কোনো প্রকার বিরোধ প্রদর্শন করেন নি। যেখানে যেখানে তাদের বসতি ছিল তাদেরকে সেখানেই থাকতে দিয়েছেন আর জিযিয়ার সামান্য অর্থ ছাড়া অন্য কোনো ধরনের জরিমানা বা কর আদায় করেন নি। যাতুস্ সালাসিল যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আরোহী যোদ্ধাদের এক হাজার দিরহাম দেয়া হয় এবং পদাতিক সৈন্যদেরকে এর এক-তৃতীয়াংশ দেয়া হয়। কাযেমার যুদ্ধটি সুদূরপ্রসারী ফলফল বহনকারী প্রমাণিত হয়েছে। এ যুদ্ধটি মুসলমানদের চোখ খুলে দেয় আর তারা দেখেছে যে, সেই ইরানী যাদের সামরিক শক্তির সুখ্যাতি সুদীর্ঘকাল থেকে প্রচারিত হয়ে আসছিল তারা তাদের পূর্ণ শক্তিসামর্থ্য সত্ত্বেও তাদের ছোট্ট একটি সেনাদলের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে নি। এই যুদ্ধে যে পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ তাদের হস্তগত হয়েছে তারা এর কল্পনাও করতে পারত না।

এরপর 'উবুল্লা'র যুদ্ধের উল্লেখ রয়েছে। এটি বারো হিজরী সনে সংঘটিত হয়েছিল। হযরত আবু বকর (রা.) হযরত খালেদ (রা.)-কে উবুল্লা থেকে ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সূচনা করতে দিকনির্দেশনা প্রদান করেছিলেন; এটি পারস্য উপসাগরের একটি উপকূলীয় জায়গা ছিল। ইরাক থেকে ভারতবর্ষ এবং সিন্ধুতে যে বাণিজ্যিক কাফেলা আসত তারা সর্বপ্রথম উবুল্লায় অবস্থান করত। উবুল্লার বিজয় সম্পর্কে দুটি রেওয়ায়েতের উল্লেখ পাওয়া যায়। একটি হল, মুসলমানরা সর্বপ্রথম হযরত আবু বকর (রা.)-এর যুগে উবুল্লা জয় করে কিন্তু পরবর্তীতে এটি পুনরায় ইরানীদের দখলে চলে যায় আর হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর যুগে মুসলমানরা একে পূর্ণরূপে দখল করে নেয়। দ্বিতীয় রেওয়ায়েটি হল, হযরত উমর (রা.)-এর যুগে এটি জয় হয়। যাহোক, আল্লামা তাবারী তার পুস্তকে হযরত আবু বকর (রা.)-এর খেলাফতকালের প্রেক্ষাপটে এই যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন। তথাপি এরপর তিনি লিখেন, হযরত আবু বকর (রা.)-এর খেলাফতকালে উবুল্লার বিজয়ের কাহিনী সাধারণ জীবনীকারদের ধ্যানধারণা ও সঠিক রেওয়ায়েতগুলোর পরিপন্থী। কেননা উবুল্লার বিজয় হযরত উমর (রা.)-এর যুগে চৌদ্দ হিজরী সনে হযরত উতবা বিন গাযওয়ান (রা.)-এর হাতে অর্জিত হয়েছিল।

ইতিহাসের অন্যান্য পুস্তকে উবুল্লা যুদ্ধের উল্লেখ এভাবে এসেছে যে, কোনো কোনো ইতিহাসবিদ এটি প্রথমবার হযরত আবু বকর (রা.)-এর কল্যাণময় যুগে সংঘটিত হওয়ার কথা উল্লেখ করেন, কিন্তু কেউ কেউ এর বিরোধিতা করেন। অর্থাৎ এ যুদ্ধ হযরত আবু বকর (রা.)-এর যুগে নয় বরং হযরত উমর (রা.)-এর যুগে সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থে হযরত আবু বকর (রা.)

এবং হযরত উমর (রা.) উভয়ের কল্যাণময় যুগেই উবুল্লার যুদ্ধ এবং উবুল্লার বিজয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। মনে হয়, প্রথমবার এর বিজয় হয়েছিল হযরত আবু বকর (রা.)-এর কল্যাণময় যুগে কিন্তু পরবর্তীতে ইরানীদের সামুদ্রিক সহায়তায় উবুল্লাবাসীরা বিদ্রোহ করে স্বাধীনতা অর্জন করে নেয়। এরপর হযরত উমর (রা.)-এর কল্যাণময় যুগে পুনরায় এর বিজয় হয়। যাহোক, উবুল্লা যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ হল, যাতুস্ সালাসিলের যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা.) হযরত মুসান্না (রা.)-কে ইরানের পরাজিত সৈন্যদের পশ্চাদ্ধাবনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন এবং একইসাথে হযরত মা'কেল (রা.)-কে উবুল্লা প্রেরণ করেন যেন তিনি সেখানে পৌঁছে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ একত্র করেন এবং বন্দিদের গ্রেফতার করেন। অতএব মা'কেল সেখান থেকে যাত্রা করে উবুল্লায় পৌঁছে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ এবং বন্দিদের একত্র করেন। পরবর্তীতে হযরত উমর (রা.)-এর কল্যাণময় যুগে এর বিজয়ের বিস্তারিত বিবরণ হল, হযরত উমর (রা.) হযরত উতবা বিন গাযওয়ান (রা.)-কে চৌদ্দ বা ষোল হিজরী সনে বসরা অভিমুখে প্রেরণ করেন। হযরত উতবা (রা.) সেখানে এক মাস অবস্থান করেন। উবুল্লার অধিবাসীরা তার মোকাবিলায় বের হয়। উবুল্লার সুরক্ষায় পাঁচ শত অনারব সৈন্য নিয়োজিত ছিল। হযরত উতবা (রা.) তাদের সাথে যুদ্ধ করে তাদেরকে পরাজিত করেন। এভাবে ইরানীরা শহরের ভিতর ঢুকে পড়ে আর হযরত উতবা (রা.) নিজ সেনাবাহিনীতে ফিরে আসেন। আল্লাহ্ তা'লা পারস্যবাসীদের অন্তরে ত্রাস সঞ্চারণ করেন। তারা শহর ছেড়ে অল্প কিছু মালপত্র নিয়ে নৌকায় চেপে নদী পাড়ি দিয়ে চলে যায়। এভাবে পুরো শহর খালি হয়ে যায় আর মুসলমানরা শহরে প্রবেশ করে। এখানে মুসলমানরা বিপুল পরিমাণে সাজসরঞ্জাম, অস্ত্রশস্ত্র অন্যান্য সামগ্রী ও বন্দিও হস্তগত হয়। এই সমস্ত মালপত্রের পঞ্চমাংশ পৃথক করে অবশিষ্ট যুদ্ধলব্ধ সম্পদ যোদ্ধাদের মাঝে বণ্টন করা হয়। মুসলমানদের সংখ্যা তিন শত ছিল।

তারপর আরেকটি যুদ্ধ হল 'মাযার'-এর যুদ্ধ। মাযারের যুদ্ধ বারো হিজরী সনের সফর মাসে সংঘটিত হয়। বারো হিজরী সনে এ যুদ্ধটি সংঘটিত হয়। মাযার মেয়সান এলাকার একটি ছোট শহর। মাযার এবং বসরার মাঝে চার দিনের সমপরিমাণ দূরত্ব রয়েছে। এই ঘটনার দিন লোকদের মুখে মুখে এই বাক্যই ছিল যে, সফর মাস এসে গেছে আর এতে নদীর মোহনায় প্রত্যেক অত্যাচারী বিদ্রোহী নিহত হবে। হুরমুয যাতুস্ সালাসিল যুদ্ধে হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-এর বিপরীতে ছিল। সে তার বাদশাহকে সাহায্যের জন্য লিখেছিল। বাদশাহ তার সাহায্যের জন্য কারিনের নেতৃত্বে এক সৈন্যদল প্রেরণ করে। কিন্তু সেই সৈন্যদল মাযার পৌঁছামাত্রই যাতুস্ সালাসিল যুদ্ধে হুরমুযের পরাজিত ও নিহত হওয়ার সংবাদ পায়। এরইমাঝে হুরমুযের পরাজিত সৈন্যদল মাযারে গিয়ে কারিনের সাথে মিলিত হয়। তাদের কোনো কোনো সৈন্যদলের সৈনিকরা অন্য দলের সৈনিকদের বলে, তোমরা যদি আজ বিক্ষিপ্ত হয়ে যাও তবে আর কখনও একত্রিত হতে পারবে না। তাই একেবারে প্রত্যাবর্তনের জন্য ঐক্যবদ্ধ হও। পলায়নপর সৈন্যবাহিনী এবং ইরান থেকে আগত নতুন সেনাসাহায্য তথা উভয় দল একত্রিত হয়। এই উভয় দল পরস্পরকে এই বলে উদ্দীপ্ত করে যে, যুদ্ধ হওয়া উচিত। যারা পলাতক সৈন্যবাহিনী ছিল তারা বলে, বাদশাহর পক্ষ থেকে সাহায্য হিসেবে প্রেরিত নতুন সৈন্যদল এসে পৌঁছেছে আর এ হল তার সেনাপতি কারিন যে আমাদের সাথে আছে। হতে পারে খোদা তা'লা আমাদেরকে বিজয় দান করবেন এবং আমাদের শত্রুদের হাত থেকে আমাদেরকে মুক্তি দিবেন আর আমাদের যা ক্ষতি হয়েছে তার কিছুটা লাঘব হবে। সুতরাং তারা এমনই করে। তারা মাযারে শিবির স্থাপন করে। কারিন যাতুস্ সালাসিল যুদ্ধ থেকে পালিয়ে যাওয়া কুবায ও অনুশেজানকে সম্মুখ সেনাদলে নিযুক্ত করে। অপরদিকে হযরত মুসান্না ও হযরত মুআন্না শত্রুদের এই প্রস্তুতির সংবাদ হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-কে পাঠিয়ে দেন। হযরত খালেদ (রা.) কারিনের সংবাদ পাওয়ামাত্রই যাতুস্ সালাসিল যুদ্ধে অর্জিত যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সেসব মুজাহিদের মাঝেই বণ্টন করে দেন যাদেরকে খোদা তা'লা তা দান করেছিলেন। এছাড়া এক-পঞ্চমাংশ হতে আরও যতটা চান দেন। যাতুস্ সালাসিল যুদ্ধে অর্জিত অবশিষ্ট মালে গনিমত এবং এই যুদ্ধ জয়ের সুসংবাদ হযরত আবু বকর (রা.)-এর সমীপে প্রেরণ করেন। আর এই বিষয়েও অবহিত করেন যে, যাতুস্ সালাসিল যুদ্ধে পরাজিত শত্রুদল এবং কারিনের নেতৃত্বে আগত নতুন সেনাদল একস্থানে সমবেত হচ্ছে। অতএব হযরত খালেদ যাত্রা করে মাযারে কারিনের সেনাবাহিনীর মোকাবিলার জন্য পৌঁছান। এরপর তিনি (রা.) তার সেনাদলের সারিগুলো ঠিক করেন। উভয় দল যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। উভয় পক্ষের মাঝে ভয়াবহ যুদ্ধ হয়। কারিন প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য ময়দানে অবতীর্ণ হয়। অপরদিক থেকে তার মোকাবিলার জন্য হযরত খালেদ এবং হযরত মা'কেল বিন আশা (রা.) সামনে অগ্রসর হন। তারা উভয়ে কারিনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। কিন্তু হযরত মা'কেল হযরত খালেদের পূর্বেই গিয়ে কারিনকে ধরে ফেলেন ও তাকে হত্যা করেন। হযরত আসেম, অনুশেজানকে এবং হযরত আদী, কুবাযকে হত্যা করেন। এই তিন নেতার

নিহত হওয়ায় ইরানীরা হতোদ্যম হয়ে পড়ে এবং যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালাতে থাকে। এই যুদ্ধে পারস্যবাহিনীর বিরাট একটি সংখ্যা নিহত হয়। আর যারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিল তারা তাদের নৌকায় চড়ে পালিয়ে যায়। হযরত খালেদ মাযার-এ অবস্থান করেন এবং প্রত্যেক নিহত ব্যক্তির জিনিসপত্র, তা যত মূল্যমানেরই হোক না কেন, সেই মুজাহিদকেই প্রদান করেন যিনি তাকে হত্যা করেছেন। সেইসাথে তিনি 'ফায়'ও (অর্থাৎ এক ধরনের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) তাদের মধ্যে বণ্টন করে দেন এছাড়া 'খুমুস' থেকেও সেসব যোদ্ধাদের ভাগ দেন যারা অসাধারণ অবদান রেখেছে। আর 'খুমুস'-এর অবশিষ্টাংশ একটি প্রতিনিধিদলের সাথে হযরত সাঈদ বিন নো'মানের তত্ত্বাবধানে মদীনায় পাঠিয়ে দেন। একটি রেওয়ায়েত অনুসারে, এই যুদ্ধে ত্রিশ হাজার ইরানী নিহত হয়েছিল, আর যারা নদীতে ডুবে মারা গিয়েছিল তাদের হিসাব এর বাইরে। বলা হয়ে থাকে, এই পানি যদি বাধা না হতো তবে তাদের মধ্য থেকে একজনও রেহাই পেত না। তদুপরি যারা পালিয়ে বেঁচেছিল তারা একদম বিশৃঙ্খল অবস্থায়, নিজেদের সবকিছু ফেলে পালিয়েছিল। যুদ্ধের পর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এবং ইরানী বাহিনীকে সহায়তা প্রদানকারীদেরকে পরিবার-পরিজনসহ বন্দি করা হয়। এসব বন্দির ভিতর আবুল হাসান বসরীও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আবুল হাসান বসরী সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে, তিনি ইমাম হাসান বসরীর পিতা ছিলেন যিনি বসরার প্রসিদ্ধ বক্তা ও সুফী ছিলেন। তিনি মুসলমান হয়েছিলেন। বলা হয়ে থাকে, আবুল হাসান বসরীকে বন্দি করার পর মদীনায় আনা হয় যেখানে তার মহিলা-মনিব তাকে মুক্ত করে দিয়েছিল। এই বিজয়ের পর সাধারণ জনগণের প্রতি অত্যন্ত কোমল আচরণ করা হয়। কৃষকসহ সেসমস্ত লোকজনদের কোনোরকম কষ্ট না দিয়ে শুধুমাত্র জিযিয়া প্রদানে সম্মত করা হয় এবং তাদেরকে তাদের নিজস্ব জমি-জমায় থাকতে দেয়া হয়। এসব প্রাথমিক কাজ শেষ করে হযরত খালেদ বিজিত অঞ্চলের শাসন-শৃঙ্খলার প্রতি মনোযোগ দেন। জিযিয়া আদায় করার জন্য স্থানে স্থানে কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হয়। বিজিত অঞ্চলের সুরক্ষার জন্য তিনি হাফীর ও 'জিসরে আযম' বা সবচেয়ে বড় পুল অঞ্চলে সেনা মোতায়েন করে রেখেছিলেন; সেই ব্যবস্থাপনা আরও সুসংগঠিত করা হয় এবং সেনাবাহিনীর প্রতিটি দলকে বিভিন্ন অফিসারের তত্ত্বাবধানে দিয়ে তাদেরকে শত্রুর গুপ্ত ও প্রকাশ্য গতিবিধি সম্পর্কে সতর্ক থাকার ও প্রয়োজনে তাদের মোকাবিলা করার নির্দেশ প্রদান করা হয়। হযরত খালেদের রণনৈপুণ্যের এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কী হতে পারে যে, ইরানের ভূখণ্ডে তার অগ্রাভিযানের শুরু থেকেই কিসরার শক্তিশালী বাহিনী পরাজিত হতে আরম্ভ করে এবং তাদের প্রবল সংকল্প, বিক্রম ও উদ্দীপনা পুরোপুরি শীতল হয়ে যায়। মাযার-এর যুদ্ধ হীরার অদূরেই সংঘটিত হয়েছিল। হীরা উপসাগর ও মাদায়েন-এর প্রায় মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত। যুদ্ধ-পরবর্তী কর্মকাণ্ড শেষ হলে হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ শত্রুদের গতিবিধি জানার চেষ্টায় ব্যাপৃত হন পাছে তারা ইসলামের বিরুদ্ধে পুনরায় সংঘবদ্ধ হচ্ছে কিনা, ইত্যাদি।

আরেকটি যুদ্ধ হল 'ওয়ালাজা'-এর যুদ্ধ। ওয়ালাজার যুদ্ধ দ্বাদশ হিজরির সফর মাসে সংঘটিত হয়। ওয়ালাজা, কাসকারের নিকটবর্তী একটি শুষ্কভূমির অঞ্চল। মাযারের যুদ্ধে ইরানীদেরকে যে লজ্জাজনক পরাজয়ের মুখোমুখি হতে হয়েছিল তা হল, তাতে তাদের বড় বড় নেতারাও নিহত হয়েছিল। একারণে পারস্য সম্রাট নতুন এক কৌশল অবলম্বন করে এবং অধিক প্রস্তুতির সাথে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। যেমন, ইরানী সরকার ইরাকে বসবাসরত খ্রিষ্টানদের অত্যন্ত বৃহৎ একটি গোত্র বকর বিন ওয়ায়েল-এর নেতৃস্থানীয় লোকদের ইরানী রাজদরবারে ডেকে পাঠায় এবং তাদেরকে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করতে সম্মত করে একটি সৈন্যদল প্রস্তুত করে ও সেই সেনাদলের নেতৃত্ব এক সুপ্রসিদ্ধ অশ্বারোহী আন্দারযাবার-এর হাতে অর্পণ করে। আর এই সৈন্যবাহিনী ওয়ালাজা অভিমুখে যাত্রা করে। ইরাকে খ্রিষ্টানদের অনেক বড় একটি গোত্র বকর বিন ওয়ায়েলের বসতি ছিল। সম্রাট আর্দশীর তাদেরকে ডেকে পাঠায় এবং তাদের একটি সেনাদল প্রস্তুত করে তাদেরকে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য ওয়ালাজা অভিমুখে প্রেরণ করে। হীরা ও কাসকার-এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের লোকজন এবং কৃষকরাও এই সৈন্যদলের সাথে যোগ দেয়। হীরা কুফা থেকে ৩ মাইল দূরে দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত একটি শহর। কাসকার কুফা ও বসরার মধ্যবর্তী একটি উপশহর ছিল। কিন্তু এই ধারণার বশবর্তী হয়ে যে, মুসলমানদের ওপর বিজয়ের বরমাল্য যেন সম্পূর্ণরূপে আরবের খিষ্টানরা লাভ করতে না পারে সেজন্য তাদের একজন প্রসিদ্ধ সেনাপতি বাহমান জাযভ্যা-কেও একটি বিশাল সৈন্যদলের সাথে তাদের পিছনেই রওয়ানা করে। যখন এই পারস্য নেতার এটি অনুভব হয় যে, তার সৈন্যবাহিনী অনেক বড় আকার ধারণ করেছে তখন সে হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ-এর ওপর আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা.) যখন ওয়ালাজা অঞ্চলে পারস্য সেনাবাহিনীর একত্রিত হবার সংবাদ পান তখন তিনি বসরার নিকটে ছিলেন। তিনি এটিই সমীচীন মনে করেন যে, পারস্য সেনাবাহিনীর ওপর তিন দিক হতে আক্রমণ করা উচিত যেন তাদের সৈন্যরা বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় এবং এভাবে

অতর্কিত আক্রমণের ফলে পারস্য সেনাবাহিনীতে অস্থিরতা ছেয়ে যায়। সুতরাং তিনি সুওয়ায়েদ বিন মুকাররিনকে নিজের স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেন আর তাকে হাফীরেই অবস্থানের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন এবং তাদের নিকট পৌঁছেন যাদেরকে দজলার নিম্নাঞ্চলে রেখে এসেছিলেন। তিনি তাদেরকে নির্দেশ প্রদান করেন যে, শত্রুপক্ষ সম্পর্কে সর্বদা সতর্ক থাকবে এবং অলসতা ও ধোঁকায় নিপতিত হবে না। আর নিজ সেনাবাহিনী নিয়ে তিনি ওয়ালাজার দিকে অগ্রসর হন এবং শত্রুবাহিনী ও তাদের সাহায্যকারী দলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন এবং প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ সৈন্যবাহিনীর উভয়পাশে মুসলিম যোদ্ধাদের নিযুক্ত রেখেছিলেন যারা আক্রমণের জন্য ওঁত পেতে ছিল। পরিশেষে ওঁত পেতে থাকা উভয় সৈন্যদল উভয় দিক হতে শত্রুপক্ষের ওপর আক্রমণ রচনা করে। ইরানী সৈন্যবাহিনী পরাজিত হয়ে পলায়ন করে। কিন্তু হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ সম্মুখ থেকে এবং ওঁত পেতে থাকা উভয় সৈন্যদল পিছন দিক হতে তাদেরকে এমনভাবে ঘেরাও করে যে, তারা দিশেহারা হয়ে পড়ে। এমনকি তাদের কারও আপন সঙ্গী-সাথীর নিহত হওয়ারও কোনো পরোয়া ছিল না। শত্রুবাহিনীর সেনাপতি পরাজিত হয়ে অবশেষে নিহত হয়। কৃষকদের সাথে হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ সেই আচরণই করেন যা তাঁর পদ্ধতি ছিল, অর্থাৎ তাদের কাউকেই হত্যা করেন নি। কেবলমাত্র যুদ্ধবাজ লোকদের সন্তান ও তাদের সাহায্যকারীদেরকে গ্রেফতার করেন এবং দেশের সাধারণ জনগণকে কর প্রদান করার ও জিম্মী হিসেবে বসবাস করার জন্য আহ্বান জানান, যা তারা গ্রহণ করে নেয়।

এরপর 'উলায়েস'-এর যুদ্ধের উল্লেখ রয়েছে। উলায়েসের যুদ্ধ ১২ হিজরী সনের সফর মাসে সংঘটিত হয়। উলায়েসও ইরাকের আনবার প্রদেশের জনপদসমূহের মধ্যে একটি জনপদ ছিল। হযরত খালেদের হাতে ওয়ালাজার যুদ্ধের দিন বকর বিন ওয়ায়েল গোত্র ও ইরানীদের আরও একটি শোচনীয় পরাজয়ের কারণে তাদের স্বজাতি খ্রিষ্টানরা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে। তারা ইরানীদেরকে এবং ইরানীরা তাদেরকে চিঠি লিখে এবং সবাই উলায়েস নামক স্থানে একত্রিত হয়। আব্দুল আসওয়াদ ইজলী তাদের নেতা নিযুক্ত হয়। অনুরূপভাবে ইরানী বাদশাহ বাহমান জাযভ্যা-কে চিঠি লিখে যে, তুমি তোমার সৈন্যবাহিনী নিয়ে উলায়েসে পৌঁছ এবং পারস্য ও আরব খ্রিষ্টানদের মধ্যে যারা সেখানে সমবেত আছে তাদের সাথে মিলিত হও; কিন্তু বাহমান জাযভ্যা স্বয়ং সৈন্যবাহিনীর সাথে যায় নি, বরং সে তার স্থলে আরেকজন প্রসিদ্ধ বীর জাবানকে প্রেরণ করে এবং তাকে নির্দেশ প্রদান করে যে, মানুষের হৃদয়ে যুদ্ধের স্পৃহা সৃষ্টি করো, কিন্তু আমি না আসা পর্যন্ত শত্রুপক্ষের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ো না, যদি না তারা স্বয়ং যুদ্ধ আরম্ভ করে। জাবান উলায়েস অভিমুখে রওয়ানা হয়। বাহমান জাযভ্যা স্বয়ং ইরানী বাদশাহ্ আর্দশীরের নিকট পরামর্শ করার জন্য যায়। কিন্তু এখানে এসে দেখে যে, বাদশাহ অসুস্থ অবস্থায় রয়েছে। এজন্য বাহমান জাযভ্যা তার সেবাশুশ্রূষায় রত হয়ে যায় এবং জাবানকে কোনো নির্দেশনা প্রেরণ করেনি। জাবান একাকী সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে রনাঙ্গণ অভিমুখে রওয়ানা হয়ে সফর মাসে উলায়েস-এ পৌঁছে। বিভিন্ন গোত্র ও হীরার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের আরব খ্রিষ্টানরা জাবানের নিকট সমবেত হয়। হযরত খালেদ যখন এসব খ্রিষ্টান সৈন্যদলের একত্রিত হবার সংবাদ পান তখন তিনি তাদের মোকাবিলা করার জন্য বের হন, কিন্তু তিনি জানতেন না যে, জাবানও নিকটে চলে এসেছে। হযরত খালেদ কেবল সেসকল আরব ও খ্রিষ্টানদের সাথে যুদ্ধ করার লক্ষ্যে এসেছিলেন, কিন্তু উলায়েস-এ জাবানের মুখোমুখি হতে হয়। জাবান যখন উলায়েস-এ পৌঁছে তখন অনারবরা জাবানকে জিজ্ঞেস করে যে, আপনার মতামত কী? আমরা কি প্রথমে তাদের খবর নিব নাকি লোকজনকে খাবার খাওয়াব? অর্থাৎ যুদ্ধ আরম্ভ করব নাকি আগে খাবার খেয়ে নিব? আর খাবার শেষ করে তাদের সাথে যুদ্ধ করব? জাবান বলে যে, শত্রুরা যদি তোমাদের প্রতিবন্ধক না হয় তাহলে তোমরাও নিশ্চুপ থাক। কিন্তু আমার ধারণা হল, তারা তোমাদের ওপর অতর্কিতে হামলা করবে আর তোমাদেরকে খাবার খেতে দিবে না। তারা জাবানের কথা না মেনে খাবারের জন্য দস্তরখান বিছিয়ে দেয়। খাবার পরিবেশন করা হয়। আর সবাইকে ডেকে তারা খাদ্য গ্রহণে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। হযরত খালেদ শত্রুর মোকাবিলায় এসে থেমে যান। জিনিসপত্র নামানোর নির্দেশ দেন। উক্ত কাজ শেষে শত্রুদের প্রতি মনোযোগী হন। হযরত খালেদ সেনাবাহিনীর পিছন দিকের সুরক্ষার জন্য সুরক্ষাকারী দল নিযুক্ত করেন আর শত্রুসারির দিকে অগ্রসর হয়ে মোকাবিলার আহ্বান জানিয়ে বলেন, আবজার কোথায়? আব্দুল আসওয়াদ কোথায়? মালেক বিন আয়েস কোথায়? মালেক ছাড়া বাকি সবাই ভীরুতার কারণে নিশ্চুপ থাকে। মালেক তার মোকাবিলায় বের হয়। হযরত খালেদ তাকে বলেন, তাদের সবার মাঝ থেকে আমার মোকাবিলায় বের হতে কীসে তোমাকে সাহস জুগিয়েছে? তোমার মাঝে আমার মোকাবিলা করার সামর্থ্য নেই। একথা বলে তিনি তার ওপর আঘাত করেন এবং তাকে হত্যা করেন। অনারবদেরকে তাদের কিছু খাওয়ার পূর্বেই দস্তরখান

থেকে উঠিয়ে দেন। জাবান তার লোকদের বলে, আমি কি তোমাদেরকে পূর্বে বলিনি যে, খাবার আরম্ভ কোরও না। খোদার কসম, কোনো সেনাপতির কারণে আমি এতটা ভীত হই নি যেমনটি আজ এই লড়াইয়ে হচ্ছি। তারা যখন খাবার খেতে সমর্থ হয় নি তখন নিজেদের বীরত্ব দেখানোর জন্য বলতে থাকে যে, আপাতত আমরা খাবার রেখে দিচ্ছি যতক্ষণ না আমরা মুসলমানদেরকে শায়েস্তা করে নেই। এরপর আমরা খাবার খেয়ে নিব। জাবান বলে, খোদার কসম, আমার ধারণা হল, তোমরা এই খাবার শত্রুদের জন্য রেখে দিয়েছ। অর্থাৎ এটি মনে কোরও না যে, তোমরা বিজয়ী হবে আর এরপর খাবার খেতে পারবে। বরং আমার মনে হচ্ছে এই খাবার এখন তোমাদের শত্রুরাই খাবে, অর্থাৎ মুসলমানরা-ই খাবে যা তোমরা বুঝতে পারছ না। তখন সে লোকজনকে বলে, এখন আমার কথা কোনো আর এই খাবারে বিষ মিশিয়ে দাও। যদি তোমরা বিজয়ী হও তাহলে খাবার নষ্ট হওয়ার এই ক্ষতি অতি সামান্য। আর শত্রুরা যদি বিজয়ী হয় তাহলে এটি তোমাদের এমন কাজ পরিগণিত হবে যাতে শত্রুরা বিপদে নিপতিত হবে। অর্থাৎ বিষাক্ত খাবার খাওয়ার করণে। কিন্তু তারা নিজেদের বিজয়ী হওয়ার বিষয়ে পূর্ণ বিশ্বাসী ছিল। তারা বলে যে, না- এর প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ বিষ মিশানোর কোনো প্রয়োজন নেই। আমরা সহজেই যুদ্ধে বিজয়ী হব এবং এরপর খাবার খাব। হযরত খালেদ নিজ বাহিনীর সারি সেভাবে বিন্যস্ত করেন যেমনটি তিনি এর পূর্বের লড়াইগুলোতেও করেছিলেন। প্রচণ্ড যুদ্ধ হতে থাকে। ইরানীদের বাহমান জাযভ্যা-এর আগমনের আশা ছিল। তাই তারা পূর্ণোদ্যমে প্রচণ্ড লড়াই করতে থাকে। কেননা জাবান তাদেরকে এই আশা দিচ্ছিল যে, সে এক বিশাল বাহিনী নিয়ে যাত্রা করেছে আর এখনই পৌঁছতে যাচ্ছে। অথচ বাস্তবতা ছিল এই যে, ইরানী বাদশাহর অসুস্থ হওয়ার কারণে বাহমান বাদশাহ্‌র কাছে পুরো পুরিস্থিতি বর্ণনা করারও সুযোগ পায় নি আর সে নিজেও সেনাবাহিনী নিয়ে আসতে পারতো না। বরং জাবানের সাথে তার কোনো প্রকার যোগাযোগও ছিল না। যাহোক, এই যুদ্ধে মুসলমানরাও তাদের বিরুদ্ধে অনেক উত্তেজিত ও উদ্দীপ্ত ছিল আর তুমুল যুদ্ধ হয়। ইরানী বাহিনীর উচ্ছ্বাস ও স্পৃহা এবং মুসলমানদের দুর্বল হতে থাকা অবস্থার উল্লেখ করতে গিয়ে এক জীবনীকার লিখেন যে, ইরানী বাহিনীর মধ্য থেকে প্রথমে খ্রিষ্টানরা আক্রমণ করে। কিন্তু তাদের সর্দার মালেক বিন কায়েস নিহত হয়। তার নিহত হতেই তাদের মনোবল হারিয়ে যায় আর তারা হতাশ হয়ে পড়ে। এটি দেখে জাবান ইরানী বাহিনীকে সামনে এগিয়ে দেয়। বাহমান নতুন সাহায্য নিয়ে আসতে যাচ্ছে, ইরানীরা এই আশায় অত্যন্ত বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে। মুসলমানরা বার বার আক্রমণ করে। কিন্তু প্রতিবার ইরানীরা পরম বীরত্ব ও অবিচলতার সাথে আক্রমণ প্রতিহত করে অবশেষে হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ জাগতিক উপায় উপকরণ ও মাধ্যমসমূহকে অকার্যকর দেখে একান্ত বিনয়ের সাথে হাত উঠিয়ে দোয়া করেন এবং নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহ্! তুমি যদি আমাকে শত্রুর ওপর বিজয় দান করো তাহলে আমি শত্রুদের মাঝে কাউকে রেহাই দিব না এবং এই নদী তাদের রক্তে লাল হয়ে যাবে। কতক পুস্তকে লেখা আছে, হযরত খালেদ (রা.) শপথ করেছিলেন অথবা মানত করেছিলেন যে, এ যুদ্ধে যদি বিজয় লাভ হয় তাহলে কোনো যুদ্ধবাজ শত্রুকে জীবন্ত ছাড়ব না। মোটকথা, এরপর হযরত খালেদ (রা.) রণকৌশলের অংশ হিসেবে সৈন্যদেরকে ডান ও বাম দিক থেকে গিয়ে ইরানী সেনাবাহিনীর পশ্চাৎভাগে আক্রমণ করার আদেশ দেন। এই আক্রমণের ফলে ইরানী সেনাবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে আর পলায়ন করা অথবা অস্ত্র সমর্পণ করার মাঝেই তারা নিজেদের নিরাপত্তা নিহিত বলে মনে করে। হযরত খালেদ (রা.) আদেশ দিলেন যে, শত্রুকে ধরে বন্দি করো আর যারা যুদ্ধ করতে উদ্যত তাদের বৈ অন্য কাউকে হত্যা কোরও না। কেবল তাদেরকেই হত্যা করবে যারা মোকাবিলা করবে।

এ বিষয়ে এক রিসার্চ সেল (তথা কেন্দ্রীয় গবেষণা কমিটির) নোট আছে আর আমিও দেখেছি যে, আমার কাছে তা সঠিক মনে হয়েছে। এ বিষয়টি স্পষ্ট করতে গিয়ে তাবারীসহ অধিকাংশ জীবনীকারক এবং ইতিহাসবিদরা উল্লেখ করেছেন যে, হযরত খালেদ (রা.) নিজের এই দোয়ায় যে শপথ করেছিলেন তদনুযায়ী এক দিন এবং এক রাত ঐসকল বন্দিদেরকে হত্যা করে নদীতে নিক্ষেপ করা হয়েছিল যেন তাদের রক্তে পানি রক্তবর্ণ ধারণ করে অর্থাৎ তিনি কেবল যোদ্ধাদের সাথে যুদ্ধই করেন নি বরং বন্দিদেরকেও হত্যা করেন আর এ কারণে উক্ত নদী আজও 'নেহরুদ দাম' তথা রক্তের নদী নামে প্রসিদ্ধ। যা-ই ঘটে থাকুক, বন্দিদেরকে হত্যা করে নদীতে ফেলে দেয়ার বিষয়টি সঠিক মনে হয় না। জীবনীকারগণ কিছুটা অতিশয়োক্তি বা ভুলত্রুটির শিকার হয়েছেন। খুবসম্ভব সেসব মস্তিষ্ক যারা ইসলামী যুদ্ধসমূহে জেনেশুনে অত্যাচার এবং বর্বরতার মিথ্যা কাহিনী যোগ করার দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে নিয়েছেন, তারা যেখানেই সুযোগ পেয়েছেন, সেখানেই নিজেদের পক্ষ থেকে এসব কল্পকাহিনী সংযুক্ত করে দিয়েছেন। জীবনীকারদের মাঝে কতক

শত্রুও ছিল। এমন শত্রুতা পোষণকারী অথবা বিদ্বেষ পোষণকারী যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোনো না কোনো এমন কথা লিখে দিত, তারাই হয়তো লিখে দিয়ে থাকবে যে, বন্দিদেরকে হত্যা করে নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছেন। যাহোক, বাহ্যত মনে হয় যে, (অতিরঞ্জিত) এমন কোনো কথা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যেন ধোঁকা ও প্রতারণার মাধ্যমে লোকদের সম্মুখে একথা উপস্থাপন করতে পারে যে, দেখ! মুসলমানরা কীভাবে অত্যাচার ও নির্যাতন করেছে আর নিরস্ত্র বন্দিদেরকে হত্যা করা হয়েছে। যদিও প্রথম কথা হল, বন্দিদেরকে হত্যা করা সেযুগের রীতিনীতি এবং চলমান যুদ্ধের রীতি অনুযায়ী কোনো আপত্তির বিষয় ছিল না কিন্তু ইসলামী যুদ্ধ আর বিশেষকরে মহানবী (সা.)-এর আশিসময় যুগে এবং খেলাফতে রাশেদার যুগের যুদ্ধসমূহে কার্যত এমন হয়ও নি যে, বন্দিদেরকে এভাবে (নির্বিচারে) হত্যা করা হয়ে থাকবে। যদিও ঐসকল যুদ্ধে হাজার হাজার বরং লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় নিহত হওয়ার কথা দেখা যায় কিন্তু তারা সবাই যুদ্ধ চলাকালীন সময় নিহত হয়েছিল। হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-এর ন্যায় সেনাপতির যুদ্ধ বিষয়ক ঘটনাবলী অধ্যয়ন করলে দেখা যায় তিনিও যতদূরসম্ভব যুদ্ধক্ষেত্রেও প্রত্যেক সেই ব্যক্তির প্রাণ ভিক্ষা দিয়েছেন যে অস্ত্র সমর্পণ করেছে অথবা আনুগত্য স্বীকার করেছে আর যাকেই হত্যা করেছেন, জীবনীকারকদের কল্পকাহিনী রচনা সত্ত্বেও অনুসন্ধানে তাকে হত্যা করার বস্তুনিষ্ঠ কারণ পাওয়া গেছে। মোটকথা, এই ঘটনাকে যদি দেখা হয় তাহলে এটি কিছুটা মনগড়া কিচ্ছাকাহিনী মনে হয় কেননা ইতিহাসবেত্তা এবং জীবনীকারক যারা এ জায়গাগুলোর বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন আর এক্ষেত্রে প্রত্যেক সূক্ষাতিসূক্ষ্ম বিষয়ও উল্লেখ করেছেন তাদের মধ্যে অনেকেই উক্ত ঘটনা আদৌ উল্লেখই করেন নি; আর এটি এ কথা সাব্যস্ত করে যে, সেগুলো ছিল মনগড়া কথা। একজন মুক্তমনা লেখক যিনি খুব স্বাধীনভাবে ইতিহাস বর্ণনা করে থাকেন, তিনি এমন অনেক আপত্তিকর কথাও বর্ণনা করে থাকেন, যার সাথে একমত হওয়া যায় না, তিনিও এই ঘটনা উল্লেখ করার পর লিখেন যে, রেওয়ায়েত বর্ণনাকারীরা এ রেওয়ায়েত বর্ণনা করে সীমাতিরিক্ত অতিশয়োক্তি করেছেন। এটি নিশ্চিত যে, খালেদ (রা.) ইসলামের শত্রুদের ওপর সহিংসতা চালিয়েছেন, যা দেখে কা'কা (রা.) এবং তাঁর সঙ্গীসাথীরা নিরব থাকতে পারেন নি। অর্থাৎ বন্দিদের সাথে কঠোরতা করা হয়েছিল ঠিকই কিন্তু হত্যা করা হয়েছিল কথাটি ভুল। একইভাবে আরেক লেখক এ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন যা থেকে বুঝা যায়, সত্যিকারার্থে ইরানীদের হত্যা করে নদীতে ফেলা হয় নি। যেমন, তিনি লিখেন, হযরত খালেদ ক্ষীপ্রতার সাথে হামলা করে এমনভাবে খ্রিষ্টানদের হত্যা করেন এবং ইরানী সারিগুলোকে এমনভাবে ছিন্নভিন্ন করেন যেন তারা মৃৎ নির্মিত ছিল রক্ত-মাংসের মানুষ নয়। যেহেতু ইরানী অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল তাই তারা অর্ধচন্দ্রের মত বৃত্ত করে মুসলমানদের ঘিরে ফেলেছিল। পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছিল তা হল, মুসলমানদের চারিদিকে ইরানী এবং খ্রিষ্টান আরব ছিল আর গভীর উদ্দীপনার সাথে যুদ্ধ করছিল। কিন্তু মুসলমানরা যে উদ্দীপনার সাথে যুদ্ধ করছিল তা খ্রিষ্টানদের মাঝে ছিল না। প্রত্যেক মুসলমান রক্তপিপাসু সিংহে পরিণত হয়েছিল এবং ভয়ঙ্কর আক্রমণ করে খ্রিষ্টানদেরকে তৃণলতার ন্যায় টুকরো টুকরো করছিল। যদিও ইরানীরাও মুসলমানদেরকে শহীদ ও আহত করছিল কিন্তু মুসলমান খুব কমই মারা যাচ্ছিল। আর যারা আহত হতো তারা আরও উচ্ছ্বাস-উদ্দীপনার সাথে যুদ্ধ করত। ইরানী এত ব্যাপকহারে মারা যাচ্ছিল যে, তাদের লাশে রণক্ষেত্র ভরে যায়। যেসমস্ত ইরানী আহত হতো তারা রণক্ষেত্র থেকে সরে যেত। মুসলমানরা এতটা রক্তপাত ঘটায় যে, তাদের কাপড়ে রক্ত জমাট বেধে যায়। খালেদ বিন ওয়ালিদেরও একই অবস্থা ছিল। ইরানীদের রক্তে ভূমি প্লাবিত হয়ে যায় এবং অতিরিক্ত রক্ত পানির মত প্রবাহিত হতে থাকে। অবশেষে ইরানীরা পরাজিত হয় এবং তারা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য অবস্থায় পলায়ন করে। মুসলমানরা তাদের পিছুধাওয়া করে এবং বহুদূর পর্যন্ত তাদের ধাওয়া করে হত্যা ও বন্দি করতে থাকে। ইরানীরা কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে এমনভাবে পলায়ন করে যে, তাদের সহস্র সহস্র সৈন্য নদীতে ডুবে যায়। ইরানীরা যখন অনেক দূরে চলে যায় তখন মুসলমানরা ফিরে আসে। এ যুদ্ধে সত্তর হাজার ইরানী নিহত হয়েছে। একশ আটত্রিশ জন মুসলমান শহীদ হন। যাহোক, ঐতিহাসিকরা এতেও অত্যন্ত বিস্মিত হয় যে, মুসলমানরা কীভাবে ইরানীদের এত বিশাল বাহিনীকে হত্যা করল! একজন ইতিহাসবিদ লিখেছেন, এই উদ্ধৃতি থেকে বুঝা যায়, নদীর পানি লাল হওয়া সংক্রান্ত ঘটনা যদি সঠিকও মনে করা হয় তাহলে যাদের কারণে নদীর পানি রক্তলাল হয়ে যায় তা সেসমস্ত আহত সৈন্যদের ডুবার ফলেও হতে পারে। তাই বলা যেতে পারে, এমন ঘটনায় কিছুটা অতিরঞ্জিতও করা হয়েছে যেকারণে ইসলামী যুদ্ধ এবং খালেদ বিন ওয়ালিদের সত্তার ওপর সূক্ষ্ম হামলাকারীরা সুযোগ পেয়েছে। এই যুদ্ধসমূহে মুসলমানদের ওপর হিংস্র পদ্ধতি অবলম্বনের অপবাদ আরোপ করা হয়েছে। যাহোক, আল্লাহ্ তা'লা ভাল জানেন কিন্তু বাহ্যত মনে হয় এটি কেবল অপবাদ মাত্র। শত্রুরা যখন পরাজিত হয়, তাদের বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং

মুসলমানরা তাদের পিছুধাওয়া করে ফিরে আসে তখন হযরত খালেদ খাবারের কাছে এসে দণ্ডায়মান হন এবং বলেন, আমি এই খাবার তোমাদেরকে দিচ্ছি, এটি তোমাদের জন্য কেননা মহানবী (সা.) যুদ্ধের সময় ময়দান ছেড়ে পলায়নপর শত্রুদের প্রস্তুতকৃত খাবার পেলে তিনি (সা.) তা সেনাবাহিনীর মাঝে বিতরণ করতেন। অতএব মুসলমানরা রাতের খাবার হিসেবে তা খেতে আরম্ভ করে। উলায়েস-এর যুদ্ধে সত্তর হাজার শত্রুবাহিনী নিহত হয় যেভাবে পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

'আমগোয়শিয়া'-এর বিজয় সম্বন্ধে লেখা আছে, আমগোয়শিয়া-কে আল্লাহ্ তা'লা বার হিজরীর সফর মাসে কোনো যুদ্ধ ছাড়াই বিজিত করেছিলেন। আমগোয়শিয়া ইরাকের একটি জায়গা। হযরত খালেদ যখন উলায়েস-এর যুদ্ধ শেষ করেন তখন তিনি প্রস্তুতি গ্রহণ করে আমগোয়শিয়া আসেন কিন্তু তাঁর আসার পূর্বেই সেখানকার অধিবাসী দ্রুত গ্রাম ছেড়ে পলায়ন করে এবং সওয়াদ নামক স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। ইরাকের সেসব জনপদ মুসলমানরা হযরত উমর (রা.)-এর খেলাফতকালে জয় করে আর ক্ষেতের সবুজ-শ্যামলতার কারণে একে সওয়াদ নামকরণ করা হয়। হযরত খালেদ (রা.) আমগোয়শিয়া ও এর আশপাশে যা কিছু ছিল সেগুলোকে সুবিন্যস্ত করার আদেশ প্রদান করেন। আমগোয়শিয়া হীরার সমান (একটি) শহর ছিল। উলায়েস-এ সেই এলাকার সেনাছাউনি ছিল। আমগোয়শিয়াতে মুসলমানরা এত বেশি মালে গনিমত লাভ করে যে, যাতুস্ সালাসিল (যুদ্ধাভিযান) থেকে শুরু করে তদবধি কোনো যুদ্ধে লাভ হয় নি। এই যুদ্ধে অশ্বারোহীরা পনেরশ দিরহাম করে লাভ করে আর এই অংশ সেই যুদ্ধলব্ধ সম্পদের বাইরে ছিল যা অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শনকারীদের দেয়া হয়েছিল। উলায়েস ও আমগোয়শিয়ার বিজয়ের সংবাদ হযরত খালেদ (রা.) বনু ইজল (গোত্রের) জান্দাল নামক এক ব্যক্তির মারফত প্রেরণ করেছিলেন, যিনি একজন সাহসী গাইড (তথা পথপ্রদর্শক) হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি হযরত আবু বকর (রা.)-এর সকাশে উপস্থিত হয়ে উলায়েস বিজয়ের সুসংবাদ, মালে গনিমতের পরিমাণ, যুদ্ধবন্দিদের সংখ্যা, খুমুসে (বা গনিমতের এক-পঞ্চমাংশে) যেসব জিনিস লাভ হয় এবং যেসকল ব্যক্তি যুদ্ধ ক্ষেত্রে বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন তাদের বিস্তারিতএবং বিশেষভাবে হযরত খালেদ (রা)-এর বীরত্বগাঁথা অতি উত্তমরূপে বর্ণনা করেন। তাঁর সাহস, সুচিন্তিত মতামত এবং বিজয়ের সংবাদ উপস্থাপনের ধরন হযরত আবু বকর (রা.) খুবই পছন্দ করেন। অর্থাৎ যে প্রতিনিধি প্রেরণ করা হয়েছিল তাঁর বর্ণনার রীতি আর বীরত্বগাঁথা উপস্থাপনের যে পদ্ধতি ছিল তা হযরত আবু বকর (রা.) খুব পছন্দ করেন। তিনি (রা.) তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার নাম কী? সে নিবেদন করে, আমার নাম জান্দাল। তিনি (রা.) বলেন, জান্দাল খুব সুন্দর! অতঃপর তিনি (রা.) তাঁকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে একজন দাসী প্রদানের আদেশ দেন, যার ঘরে তার সন্তান হয়েছিল। এভাবে সেসময় হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, এখন আর মহিলাদের গর্ভে খালেদ বিন ওয়ালিদের মত সন্তানের জন্ম হবে না। বাকি (অংশ) ইনশাআল্লাহ্ ভবিষ্যতে (বর্ণনা করা হবে)। *(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক এর তত্ত্বাবধানে অনূদিত)*

পাক্ষিক **'আহ্‌মদী'** নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন। পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন পাক্ষিক **'আহ্‌মদী'**র সাথেই থাকুন। ইন্টারনেটের মাধ্যমে **'আহ্‌মদী'** পত্রিকা পড়তে Log in করুন **www.theahmadi.org** পাক্ষিক 'আহ্‌মদী'র নতুন ই-মেইল আইডি– **pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com**

সীরাতুল মাহদী (আ.)

[হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনচরিত]

প্রণেতা: হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ. (রা.)

ভাষান্তর: মাওলানা জুবায়ের আহমদ

(৩১তম কিস্তি)

১২৩) **বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম:** খাকসার বর্ণনা করছি, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ১৮৭৯ সালে যখন বারাহীনে আহমদীয়া সম্পর্কিত বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন তখন তিনি (আ.) বারাহীনে আহমদীয়ার রচনা শুরু করে দিয়েছিলেন আর সেই সময় পর্যন্ত পুস্তকটি দুই আড়াই হাজার পৃষ্ঠার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। আর সেখানে তিনি (আ.) ইসলামের সত্যতা সম্পর্কিত তিনশত এমন জোরালো যুক্তি উপস্থাপন করেন এবং উপস্থাপিত দলিল সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দাবি ছিল, এর মাধ্যমে ইসলামের সত্যতা সূর্যের ন্যায় প্রতীয়মান হবে। আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ইচ্ছা ছিল, পুস্তক প্রকাশের প্রস্তুতির সাথে সাথে পুস্তকটির রচনাতেও আরও পরিপূর্ণতা প্রদান করতে থাকবেন। আর এর শুরুতে একটি ভূমিকা লিখার পাশাপাশি কিছু প্রারম্ভিক কথাও যুক্ত করবেন আর এর সাথে সাথে আবশ্যক কিছু পাদটিকাও লিখতে থাকবেন। সুতরাং বর্তমানে বারাহীনে আহমদীয়ার প্রকাশিত যে চার খণ্ড রয়েছে সেগুলোর ভুমিকা আর পাদটিকাগুলো এর প্রকাশের সময় যুক্ত করা হয়েছে। আর সেগুলোর মাঝে প্রাথমিক অবস্থায় লেখার খুব কম অংশই অবশিষ্ট রয়েছে অর্থাৎ তা গুটিকয়েক পৃষ্ঠার বেশি হবে না। এই ধারণাটি আমরা এভাবে পেতে পারি যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বারাহীনে আহমদীয়ার প্রকাশকালে যে তিনশত দলিল লিখেছিলেন তার মাঝ থেকে শুধুমাত্র একটি দলিল বর্ণিত হয়েছে আর তা-ও অসম্পূর্ণ। এই চার খণ্ড ছাপানোর কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর বাকি অংশের প্রকাশের কাজ আল্লাহ তা'লার অভিপ্রায়ে থেমে যায় আর কোনো কথা যে, পরবর্তিতে এই রচনার পাণ্ডুলিপি কোনো কারণে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বারাহীনে আহমদীয়া চতুর্থ খণ্ডের শেষের দিকে "হাম আওর হামারী কিতাব" শীর্ষক যে ইশতেহার দিয়েছেন সেখানে তিনি (আ.) বলেছেন যে, শুরুর দিকে যখন বারাহীনে আহমদীয়া লেখা হয়েছিল তখন একরকম ছিল কিন্তু পরবর্তীতে অর্থাৎ এর প্রকাশের সময় যখন এর পাদটিকা প্রভৃতি লেখা হচ্ছিল আর তা ছাপিয়ে প্রকাশ করা হচ্ছিল তখন এর চেহারা পরিবর্তন হয়ে যায়। অর্থাৎ আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে তাঁকে প্রত্যাদিষ্ট করা হয় এবং ঊর্ধ্বলোক থেকে তাঁকে নির্দেশ প্রদান করা হয়, তখন তিনি তাঁর পূর্ববর্তী চিন্তাধারা পরিত্যাগ করেন আর তিনি বুঝে যান, এখন বিষয়টি আল্লাহ তা'লার হাতে। তিনি যেভাবে চাইবেন সেভাবে তার কাছ থেকে ধর্মের সেবা গ্রহণ করবেন। অতএব এরপর থেকে আশিটির কাছাকাছি পুস্তক ও শত শত বিজ্ঞাপন প্রকাশ আর বিভিন্ন বক্তৃতা যা তার পক্ষ থেকে ধর্মের সেবায় প্রকাশিত হয়েছে আর বর্তমানে তাঁর ওফাতের পরও ধর্মের যে সেবা তাঁর অনুসরীদের মাধ্যমে সম্পাদিত হচ্ছে এই সব কিছু তারই ফলে হচ্ছে। আর আমি মনে করি সেই তিনশত দলিলের মাধ্যমে ইসলামের সত্যতা যেভাবে প্রমানিত হত যা তিনি বারাহীনে আহমদীয়ায় লিখেছিলেন তার চেয়ে অনেক বেশি তার ব্যক্তিসত্তার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে যার বহিঃপ্রকাশ পরবর্তীতে মাহদী আর মসীহ্-এর রঙ্গে হয়েছে। আর নিশ্চিতরূপে সেই মহান রচনাসমূহ যা পরবর্তীতে আল্লাহ তা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাত দ্বারা প্রকাশ করেছেন কেবলমাত্র তাঁর পবিত্র সত্তাই সেই তিনশত দলিলের চেয়ে অধিক ইসলামের সত্যতার স্বপক্ষে প্রতিভাত হওয়ার ছিল কেননা এই তিনশত দলিলের বেশিরভাগই হয়তো সাধারণ জ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা হয়েছিল কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্তা যার বহিঃপ্রকাশ নবুয়্যতের আদলে হয়েছিল নিজের মাঝে এক অন্যরকম আকর্ষণক্ষমতা আর শক্তি রাখতো।

১২৪) **বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীমঃ** মৌলভী শেরআলী সাহেব আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, একবার লালা মালাওয়ামাল আমাকে বলেছে, মির্যা সাহেব অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) একবার আমাকে একটি ছোট বক্স খুলে দেখিয়েছিলেন যার মাঝে তাঁর একটি পুস্তকের পাণ্ডুলিপি রাখা ছিল আর তিনি আমাকে বলছিলেন যে, আমার সম্পত্তি আর অর্থকরী সবকিছু এখন এগুলোই। খাকসার নিবেদন করছি, এগুলো বারাহীনে আহমদীয়ার পাণ্ডুলিপি ছিল।

১২৫) **বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীমঃ** মৌলভী শেরআলী সাহেব আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, একবার পীর সিরাজুল হক সাহেব রোযা ছিলেন কিন্তু তার তা মনে ছিল না। আর তিনি পান করার উদ্দেশ্যে কারও দ্বারা পানি আনিয়ে নেন। সেই সময় কেউ একজন বলে, তিনি কি রোযা রাখেন নি? তখন পীর সাহেবের মনে পড়ে যে, আমি তো রোযা রেখেছি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তখন সেখানেই উপস্থিত ছিলেন। তিনি পীর সাহেবকে বলেন, রোযা রাখা অবস্থায় কেউ ভুলবশত কিছু পান করলে বা খেয়ে নিলে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জন্য আতিথেয়তা হয়। কিন্তু তিনি যে পানি পান করার বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছেন, এভাবে জিজ্ঞেস করা সমীচীন নয়। এই জিজ্ঞেস করার কারণেই তিনি এই পুরস্কার থেকে বঞ্চিত থেকে গেলেন। ... *(চলবে)*

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

পাক্ষিক আহ্‌মদী পত্রিকার সম্মানিত গ্রাহকগণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, গ্রাহকগণের অনেকেরই গত বছরের গ্রাহক-চাঁদা বাকি পড়েছে। তাই অনুগ্রহপূর্বক প্রত্যেকে গত বছরের বকেয়া গ্রাহক-চাঁদা (প্রতি বছর ২৫০/- টাকা হারে) পরিশোধ করে বাধিত করবেন। পাক্ষিক আহ্‌মদী সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য পেতে যোগাযোগ করুনঃ **ফারুক আহমদ বুলবুল, সহকারী লাইব্রেরিয়ান, আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।**

মোবাইল নং- ০১৭৩৬-১২৪৭০৪, প্রয়োজনে গ্রাহক-চাঁদা ০১৯১২৭২৪৭৬৯ নম্বরে বিকাশ করতে পারেন। ওয়াসসালাম।

খাকসার
সেক্রেটারী ইশায়াত
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেছেন,

"তোমরা ভালভাবে স্মরণ রাখবে! তোমাদের সমস্ত উন্নতি খেলাফতের সাথে সম্পৃক্ত। যেদিন তোমরা এ কথা বুঝতে অক্ষম হবে এবং খেলাফতকে কায়েম রাখবে না, সেদিন তোমাদের ধ্বংস ও সর্বনাশের দিন হবে। আর যদি তোমরা এ সত্যকে অনুধাবন করো এবং খেলাফতের এ নেযামকে কায়েম রাখ, তাহলে সমগ্র পৃথিবী যদি সম্মিলিতভাবে তোমাদেরকে ধ্বংস করতে চায়, তবুও তারা তা পারবে না। তোমাদের বিপরীতে তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ ও অকৃতকার্য হয়ে থাকবে। যতদিন তোমরা একে (নেযামে খেলাফতকে) দৃঢ়ভাবে ধরে রাখবে ততদিন পৃথিবীর কোনো বিরোধিতাই কার্যকর হবে না।"

(দরসে কুরআন, পৃষ্ঠাঃ ৭৩, প্রকাশিত ১৯২১ইং)

নেযামে খেলাফতের গুরুত্ব

মূল: মাহমুদ আহমদ মালেক

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, রাওয়ালপিন্ডির সাবেক আমীর মরহুম ফযলুর রহমান খান সাহেবের

নেযামে খেলাফতের গুরুত্ব এবং সম্মানিত খলীফাদের বরাতে কিছু সুষমামণ্ডিত স্মৃতিচারণ

পঞ্চম ও শেষ কিস্তি

মোহতরম ফযলুর রহমান সাহেব ডাক্তার মুহাম্মদ যুবায়ের সাহেবের মেয়ে মোহতরমা গওহর সুলতানা সাহেবাকে ১৯৬১ সালের ৯ই ডিসেম্বর বিয়ে করেন। ডাক্তার সাহেব মরহুমের চাচাত ভাই ছিলেন এবং পাড়াহ্ চুনারে বসবাস করতেন। তিনিও অত্যন্ত ভদ্র, দরিদ্র-সেবক এবং খুবই দোয়ায় অভ্যস্ত একজন মানুষ ছিলেন। অনেক মানুষকে তিনি নিয়মিত অযিফা বা ভাতা প্রদান করতেন যা তার মৃত্যুর পর পরিবারের লোকেরা জানতে পারে।

শ্রদ্ধেয়া গওহর সুলতানা সাহেবা ২০২১ সালের ৭ই অক্টোবর, ৭৯ বছর বয়সে লন্ডনে ইন্তেকাল করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) যুক্তরাজ্যের ইসলামাবাদে তাঁর জানাযার নামায পড়ান। এরপর মরদেহ রাবওয়াতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং বেহেশতী মকবেরায় তাকে সমাহিত করা হয়। মরহুমা খুবই পুণ্যবতী, দোয়ায় অভ্যস্ত, ধার্মীক, নামায-রোযায় অভ্যস্ত, নিয়মিত কুরআন পাঠকারিণী এবং খেলাফতের সাথে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রক্ষাকারিণী বুযূর্গ মহিলা ছিলেন। তার স্বামী যখন রাওয়াপিন্ডি জেলার আমীর ছিলেন তখন তিনি সর্বদা এবং সকল ক্ষেত্রে তার সেবা করেছেন এবং তাকে সহযোগিতা করেছেন। নিজের হালকায় তিনি লাজনার সেক্রেটারী খিদমতে খালক হিসেবেও সেবা করার তৌফিক পেয়েছেন। মরহুমা বাড়ির কাজের লোকদের প্রতিও অনেক খেয়াল রাখতেন। ২০০৫ সনে যখন পাকিস্তানে ভূমিকম্প হয় তখন লাজনা সদস্যাদের সাথে মিলিটারী হাসপাতালে গিয়ে রোগীদের সেবা-শুশ্রূষা করেন। অনেক সাহসী ও উদ্যমী নারী ছিলেন। ক্যানসারের রোগী ছিলেন কিন্তু শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত অত্যন্ত সাহসিকতা ও দৃঢ়তার সাথে এর মোকাবিলা করেন। মরহুমা মূসীয়া ছিলেন। মোহতরম ফযলুর রহমান সাহেবের ঔরসে তাঁর গর্ভে আল্লাহ্ তা'লা চারজন পুত্র এবং দু'জন কন্যা সন্তান দান করেন, আল্লাহ্‌র কৃপায় তারা সবাই উচ্চশিক্ষিত। আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে অনেক পৌত্র-পৌত্রী এবং দৌহিত্র-দৌহিত্রী দান করেছেন। তার এক পুত্র ড. আতাউল কুদ্দুস সাহেব বর্তমানে যুক্তরাজ্যের নায়েব আমীর এবং ইসলামাবাদের রিজিওনাল আমীর এবং আরেক ছেলে ডাক্তার হাবীবুর রহমান সাহেব (কানাডার) রিজাইনা জামা'তের আমীর হিসেবে জামা'তের সেবা করার তৌফিক পাচ্ছেন।

সকল আত্মীয়-স্বজনের সাথে মোহতরম ফযলুর রহমান খান সাহেবের প্রীতিপূর্ণ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। তাঁর ব্যক্তিত্বে এমন এক আকর্ষণ ছিল যে, পুরো পরিবারের সমস্যারা তাকে অত্যন্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন এবং নিজেদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে তাঁর কাছে আসতেন আর তিনি স্বীয় দূরদর্শিতার ভিত্তিতে তাদের পরামর্শ প্রদান করতেন। তিনি নিজ পিতামাতাকে খুবই সম্মান ও আনুগত্য করতেন। তার পিতা ৯৬ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন এবং তিনি তাঁর অনেক সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। অফিস থেকে ফিরে সোজা তাঁদের কাছে যেতেন এবং প্রায়শ খাবারও তাঁদের কাছে বসেই খেতেন। নিজের সন্তানদের সর্বদা উপদেশ দিতেন যে, দাদাজানকে একাকীত্ব অনুভব করার সুযোগ দিবে না। একইভাবে নিজের শ্বশুর-শ্বাশুড়িকেও অনেক সম্মান করতেন। তার শ্বশুর-শ্বাশুড়ি উভয়ের মরদেহ তার বাড়ি থেকেই বেরিয়েছিল আর তাদের দাফন-কাফনের সকল আয়োজনও তিনিই করিয়েছেন।

তিনি বাড়িতে সর্বদা যিকরে এলাহী এবং ধর্মীয় আলোচনা করতে পছন্দ করতেন। যখনই সুযোগ পেতেন কোনো না কোনো তরবীয়তমূলক কথা এত সুন্দরভাবে বর্ণনা করতেন যে, যারা শুনতো তাদের ওপর গভীর প্রভাব পড়তো। টিভিতে অনর্থক অনুষ্ঠান নিজেও দেখতেন না আর বাড়িতেও কারও দেখার অনুমতি ছিল না। তবে, ভাল অনুষ্ঠান এবং খেলাধূলার প্রোগ্রাম বাচ্চাদের সাথে বসে দেখতেন। নিজের সন্তানদের জাগতিক সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদানের চেষ্টা করেছেন তবে, কোনো জিনিষেরই অপব্যবহার করতে দিতেন না। খুবই অতিথিপরায়ণ ছিলেন। যদি হঠাৎ করে কোনো অতিথি চলে আসতো এবং বাড়িতে কোনো বিশেষ জিনিষ না থাকতো তাহলে বাজার থেকে তা আনিয়ে নিতেন। অতিথেসেবার পাশাপাশি তাঁর অন্যদের কষ্টের প্রতিও অনেক খেয়াল থাকতো। তিনি যখন ফেক্টো সিমেন্ট কম্পানিতে কাজ করতেন তখন সেখানে অনেক সময় বিদেশ থেকে প্রকৌশলীরা আসতেন, তাদের মধ্যে জার্মানির একজন প্রকৌশলী ছিলেন John Boie। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তিনি তার দুটি পা-ই হারিয়েছিলেন এবং

তিনি কৃত্রিম পা ব্যবহার করতেন। এই ভদ্রলোক হোটেল পার্ল কন্টিনেন্টালে থাকতেন এবং প্রতিদিন সকালে তার সাথেই গাড়িতে করে ফ্যাক্টরিতে যেতেন। একদিন তার জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি বলেন যে, তিনি রাতের খাবার খান না বরং শুধু চা পান করেন। কারণ জানতে চাইলে বলেন, সন্ধ্যায় তিনি যখন হোটেলে পৌঁছেন তখন খাবারের সময় হয় না আর তিনি যেহেতু ক্লান্ত থাকেন তাই (কৃত্রিম) পা'গুলো খুলে রেখে শুয়ে পড়েন। এরপর খাবারের সময় আবার 'পা' পরে খাবার খেতে যাওয়ার মত মনোবল পান না। একথা শুনে মরহুম খান সাহেব খুবই কষ্ট পান এবং সেদিন থেকে তিনি John Boie-কে প্রতিদিন নিজের বাড়িতে নিয়ে আসতেন এবং খাবার খাইয়ে ফেরত পাঠাতেন। মিস্টার জন-এর জার্মানিতে ফেরত যাওয়ার পরও তার সাথে খান সাহেব সম্পর্ক রক্ষা করেন এবং প্রতিবছর গ্রীষ্মকালে তাকে আম উপহার পাঠাতেন।

তার পরিচিতির গণ্ডি অনেক বিস্তৃত ছিল কিন্তু তার পছন্দের বিষয় সর্বদাই ছিল ইসলাম আহমদীয়াত। তিনি খোদাপ্রদত্ত প্রখর ধীশক্তির অধিকারী ছিলেন। তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়ে গভীরে অবগাহন করতেন, কখনও বিচলিত হতেন না। কোনো বিপদাপদ এলে সর্বদা দোয়ার সাহায্য নিয়েছেন এবং সবাইকে প্রবোধ দিয়েছেন। খুবই সময়ানুবর্তী ছিলেন। জুমুআর নামাযের জন্য সকাল থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন। বুযূর্গ বা প্রবীণদের সাথে তিনি প্রীতি ও শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্পর্ক রাখতেন। রাওয়ালপিন্ডি জামা'তের প্রবীণ সদস্য মোহতরম আব্দুল গাফ্‌ফার ডার সাহেব নামাযের জন্য চাইকেল চালিয়ে মসজিদে আসতেন। একবার তিনি সাইকেল থেকে পড়ে গেলে কিছুটা আঘাত পান। তখন খান সাহেব বলেন, ভবিষ্যতে তিনি যেন আর সাইকেলে না আসেন আমি তার জন্য গাড়ি এবং খাদেম পাঠিয়ে দেব।

(জীবনের) শেষ দশ-পনের বছর তাঁর শরীর ভাল ছিল না। এই সময়ে তাঁর বহুমূত্র, রক্তচাপ এবং হৃদরোগ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার অসুস্থতা তার কোনো কর্তব্য পালনে বাধ সাধতে পারে নি। শেষ তিন বছর পা দুর্বল হয়ে যাওয়ার কারণে বেশি চলাফেরা করতে পারতেন না, তাই যখন বাড়ির বাইরে যেতেন তখন অনেক সময় হুইল চেয়ার ব্যবহার করতেন। প্রতিবছর গ্রীষ্মকালে নিজের সন্তানদের কাছে ইউরোপে যেতেন এবং তিন-চার মাস সেখানে থাকতেন। লন্ডন আসা-যাওয়ার সময় সর্বদা যুগ-খলীফার কাছ থেকে অনুমতি নিতেন। অন্তিম অসুস্থতার সময়ও অনুমতি নিয়ে গিয়েছিলেন তখন সাধারণ নিয়মের বাইরে গিয়ে হুযূর (আই.) বলেন, খান সাহেব! আপাতত এখানেই থাকুন। অতএব, তিনি লন্ডনেই থেকে যান। তার স্বাস্থ্য প্রতিনিয়ত অবনতির দিকে যাচ্ছিল। মৃত্যুর তিন-চার দিন পূর্বে শ্বাসকষ্টের কারণে তিনি হাসপাতালে ভর্তি হন। ২০১২ সালের ২৯শে অক্টোবর দুপুরবেলা তাঁর হার্ট এটাক হয় এবং এতেই তিনি প্রাণ হারান। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) ২রা নভেম্বর, ২০১২ তারিখে লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে জুমুআর নামাযের সময় তাঁর এই নিবেদিতপ্রাণের উত্তম বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী সবিস্তারে বর্ণনা করেন।

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, রাওয়ালপিন্ডি জেলার আমীর মোহতরম ফযলুর রহমান খান সাহেব ২০১২ সালের ২৯শে অক্টোবর কয়েকদিন অসুস্থ থাকার পর ৮৩ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি সম্প্রতি এখানেই ছিলেন, জলসায় এসেছিলেন আর আমি তাকে বলেছিলাম, আপাতত কিছুদিন এখানেই অবস্থান করুন। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ অসুস্থ ছিলেন কিন্তু মাশাআল্লাহ্ তার মস্তিষ্ক ষোলোআনা সক্রিয় ছিল এবং অত্যন্ত সাহসের সাথে তিনি আমীরের দায়িত্বাবলী পালন করেছেন। {এরপর মরহুমের জীবনের বিভিন্ন আঙ্গিক বর্ণনা করার পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,} খেলাফত এবং জামা'তের ব্যবস্থাপনার প্রতি (তার) ঐকান্তিক ভালবাসা ও গভীর শ্রদ্ধা ছিল। প্রত্যেক সভায় আলোচনার সময় তিনি জামা'তের ঘটনাবলী, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবীদের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা এবং আহমদী খলীফাদের ঘটনাবলী উল্লেখ করতেন। সর্বদা খেলাফতের আনুগত্য এবং যুগ-খলীফার সাথে সুদৃঢ় সম্পর্ক রক্ষার বিষয়ে নিজের সন্তানদেরও জোরালো উপদেশ দিতেন। অনেক বেশি দোয়ায় অভ্যস্ত ছিলেন। (মরহুমের) সন্তানরা বলেন, বাবা প্রতিদিন সকালে বাড়ি থেকে বের হবার পূর্বে সবাইকে বসিয়ে দোয়া করাতেন। এমনকি সম্প্রতি তিনি যখন হাসপাতালে ছিলেন সেখানেও যখনই তার তন্দ্রাভাব কেটে যেত তখন সন্তানদেরকে বলতেন, এখন হাত তুলে দোয়া করে নাও। মরহুম শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী ছাড়াও দুই কন্যা এবং চারজন পুত্রসন্তান রেখে গেছেন। তাঁর বড় বোন যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন তাঁর সন্তানেরা ছোট ছোট ছিল, তাদেরকেও তিনি লালন-পালন করেছেন। এমনকি তাঁর (বড় বোনের) মেয়েদের মধ্যে এক মেয়ে দু'বার বড় ধরনের কোনো কষ্ট পেলে তার প্রতিও তিনি বিশেষভাবে দৃষ্টি রেখেছেন, তাঁর ভগ্নিকন্যাকে দু'বার বিধবা হতে হয়েছে এবং দু'বারই তিনি শহীদের স্ত্রী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছেন।

(তার সম্পর্কে) রাওয়ালপিন্ডির ভারপ্রাপ্ত আমীর মোবারক আহমদ সাহেব লিখেন, জামা'তের প্রত্যেক কর্মী– তিনি ছোট হোন বা বড়, মহিলা হোন বা পুরুষ, প্রত্যেকে তাঁর ব্যক্তিগত ভালবাসায় ধন্য ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে অসম্ভবরকম নেতৃত্বদানের যোগ্যতা দান করেছিলেন। আর খোদা প্রদত্ত যোগ্যতার ফলেই তাঁর এমারতকালে, যা নভেম্বর ১৯৯৮ সাল থেকে শুরু হয়েছিল, রাওয়ালপিন্ডি জামা'ত জান-মালের দিক দিয়ে প্রত্যেক বিভাগে উল্লেখযোগ্য উন্নতি করেছে আর রাওয়ালপিন্ডি জামা'ত দেশের উত্তম

জামা'তগুলোর মাঝে গণ্য হতে আরম্ভ করেছে। তিনি প্রায় অর্ধশতাব্দী জামা'তের সেবা করেছেন (যা দ্বিতীয় খলীফার যুগ থেকে শুরু হয়েছিল)। তিনি বিভিন্ন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন। তাঁর এমারতকালে রাওয়াপিন্ডির আহমদীয়াতের ইতিহাস সংকলন ও প্রকাশনার কাজ হয়ছে। এজন্য তাকে বৃদ্ধ বয়সে এবং বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও অনেকদিন তাকে লাগাতার ঘন্টার পর ঘন্টা বসতে হয়েছে এবং এই ঐতিহাসিক নথিপত্রের এক একটি শব্দ তিনি পড়েছেন, শুনেছেন এরপর এর অনুমোদন দিয়েছেন। একইভাবে শতবর্ষ খেলাফত জুবিলী উপলক্ষ্যে জামা'তে আহমদীয়া রাওয়ালপিন্ডি একটি নয়নাভিরাম এবং ব্যতিক্রমী খেলাফত জুবিলী স্মরণিকা প্রকাশ করার সৌভাগ্য লাভ করে। এর সমস্ত কৃতিত্বও তাঁরই প্রাপ্য, কেননা তিনি এ গুরুত্বপূর্ণ কাজের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে আগ্রহ দেখান, প্রবন্ধ লেখকদেরকে স্বয়ং টেলিফোন করে প্রবন্ধ লিখিয়েছেন।

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, ১৯৯৮ সালে খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাঁকে রাওয়ালপিন্ডি জামা'তের আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। এর পূর্বে তিনি প্রায় সাড়ে চার বছর নায়েব আমীর হিসেবেও সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তখন আমি নাযেরে আলা ছিলাম আর এটি আমি জানতাম যে, যখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) সদর খোদ্দাম ছিলেন তখন মরহুম খান সাহেব খোদ্দামুল আহমদীয়ার কায়েদ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) আমাকে লিখেন যে, (পিন্ডি) জেলার আমীরের জন্য কোনো নাম প্রস্তাব কর, তখন আমার কাছে খুব বেশি একটা নাম ছিল না তাই আমি তাঁর নাম পাঠিয়েছিলাম যা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জুর করেন এবং বলেন, হ্যাঁ আমি তাকে চিনি। উনি ব্যবস্থাপনার দিক দিয়েও খুব ভাল কাজ করেন আর এমনিতেও নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততার দিক থেকেও খুবই ভাল। ইনশাআল্লাহ্ তিনি দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবেন। এরপর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি খুব ভালভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অর্পিত দায়িত্বাবলী অত্যন্ত সুন্দরভাবে ও দক্ষতার সাথে পালন করেছেন। খেলাফতের প্রতি বিশ্বস্ত ও নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন এবং (খলীফার) ইঙ্গিত বুঝে কাজ করতে জানতেন, আর একে একপ্রকার সৌভাগ্য জ্ঞান করতেন। এছাড়া শুধু জামা'তী কাজের ক্ষেত্রেই নয়, বরং আমি দেখেছি ব্যক্তিগত বিষেও তিনি বেশ দক্ষ ছিলেন। যখন তিনি এখানে জলসায় এসেছিলেন তখন আমি তাকে বলেছিলাম, আপাতত কিছুদিন এখানে থেকে যান। কিন্তু তার স্ত্রীর হাব-ভাব দেখে আমি বুঝেছিলাম যে, তিনি হয়ত এখানে থাকতে চান না; কিন্তু তিনি সানন্দ্যে বলেন, ইনশাআল্লাহ্ যতদিন আপনি থাকতে বলবেন আমরা এখানেই থাকব। হয়ত তার নিয়তিতে এখানেই মৃত্যু লেখা ছিল এবং (আমার) জানাযা পড়ানোর ছিল তাই আল্লাহ্ তা'লা এ ব্যবস্থা করেছেন।

ডাক্তার নূরী সাহেবের সাথে তাঁর খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তিনি লিখেন, তাঁর সাথে বিভিন্ন দিক দিয়ে আমার সম্পর্ক ছিল। ঘনিষ্ঠ বন্ধুও ছিলেন আর ডাক্তার হিসেবেও (সম্পর্ক ছিল)। আর আমি তাঁর নায়েব আমীর হিসেবেও তাঁর সাথে কাজ করেছি। তিনি বলেন, আমি তাঁকে সব দিক থেকেই দেখেছি, অনেক গুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত খোদাভীরু ছিলেন, সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা রাখতেন। খেলাফতের সাথে তাঁর পূর্ণ নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও আনুগত্যের সম্পর্ক ছিল। যখনই যুগ-খলীফার কথা উচ্চারণ করতেন তখন তাঁর গলা ভারী হয়ে যেত এবং চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে থাকত। তাঁর ওঠা-বসা শুধুমাত্র জামা'তের সেবায় নিবেদিত ছিল। তিনি বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত ছিলেন এবং হুইল চেয়ার ব্যবহার করতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ধর্ম-সেবার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতেন। জীবনের শেষ দু-তিন বছর তিনি হুইল চেয়ারের ওপর নির্ভর ছিলেন। কখনও কোনো অভিযোগ করতেন না এবং কখনও ভ্রু কুঁচকাতেন না। দরিদ্র, এতিম, বিধবা ও অভাবী ছাত্রদের প্রতি তিনি খেয়াল রাখতেন। আত্মীয়-স্বজন, বিভিন্ন সঙ্কটে জড়িতদের সমস্যার সমাধান ও আর্থিক অনটনে জর্জরিত বিভিন্ন পরিবারকে সাহায্য করতেন এবং গঠনমূলক দিকনির্দেশনা দিতেন।

খোদ্দামুল আহমদীয়া, রাওয়ালপিন্ডির জেলা কায়েদ সাহেব লিখেছেন, মোহতরম আমীর সাহেব এক অনন্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত মিশুক, দরিদ্রসেবক, সর্বদা নিয়তির ওপর সন্তুষ্ট, খেলাফতের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক রক্ষাকারী, ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞতাপরায়ণ বুযূর্গ মানুষ ছিলেন। ধর্মকে পার্থিবতার ওপর প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষেত্রে সত্যিকার দৃষ্টান্ত ছিলেন। তাঁর স্নেহ ও ভালবাসা এক পিতার চেয়েও অধিক ছিল (আর এই ব্যবহারই সর্বত্র সকল আমীরের– সদর খোদ্দামুল আহমদীয়ার সংগঠনের সাথে, অন্যান্য সংগঠনের সাথে এবং সকল যুবক ও সব কায়েদের সাথে থাকা উচিত)। তিনি লিখেছেন, অধমকেও নিজের পুত্রের ন্যায় তাঁর ছায়ায় জামা'তের সেবা করার সুযোগ হয়েছে।

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, তাঁর যেসব গুণাগুণ বর্ণিত হচ্ছে এগুলো আমিও তার মাঝে দেখেছি। কোথাও কোনো অতিরঞ্জন নেই বরং (বর্ণনার ক্ষেত্রে) হয়তো কিছুটা ঘাটতি থাকতে পারে। কায়েদ সাহেব আরও লিখেন, আল্লাহ্ তা'লা আমীর সাহেবকে নেতৃত্ব ও এমারতের গুণাবলীতে খুবই সমৃদ্ধ করেছিলেন। সকল কর্মকর্তা ও কর্মীদের কাছ থেকে তাদের যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ আদায় করার কৌশল ও উপায় তাঁর ভালই জানা ছিল। সকল কর্মকর্তা বরং জামা'তের প্রত্যেক সদস্য তাঁর সব আদেশ ও উপদেশ পালন করে

আনন্দ পেতেন এবং নিজেদের জন্য সম্মানের কারণ মনে করতেন। খোদ্দামুল আহমদীয়ার প্রতিও তাঁর স্নেহ এক পিতার চেয়ে অধিক ছিল। অধম নিঃসঙ্কোচে একথা বলতে পারে যে, খোদ্দামুল আহমদীয়া রাওয়ালপিন্ডি গত দশ বছরে যে অসাধারণ উন্নতি ও দৃঢ়তা অর্জন করেছে, এক্ষেত্রে মোহতরম আমীর সাহেবের অবদান সবচেয়ে বেশি ছিল। জামা'তের সদস্যদের প্রতি ভালবাসা এবং তাদের সমস্যাবলীর প্রতি তিনি খুবই খেয়াল রাখতেন। আমীর সাহেব ২৮শে মে'র পর খোদ্দামুল আহমদীয়া রাওয়ালপিন্ডির স্কন্ধে অনেক দায়িত্ব অর্পণ করেন, যার মধ্যে বিভিন্ন নির্মাণকাজ এবং নিরাপত্তার দায়িত্বও ছিল। এসব কাজে অনেক খরচপত্রও হয়, কিন্তু আমীর সাহেব কখনও এর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন নি। একবার একজন আহমদী কর্মকর্তা এ আশঙ্কা ব্যক্ত করেন যে, আমীর সাহেব! অনেক অর্থ ব্যয় হচ্ছে, তখন আমীর সাহেব বলেন; একজন আহমদীর প্রাণের বিপরীতে লক্ষ লক্ষ টাকাও কোনো মূল্য রাখে না। যদি কোনো আহমদী প্রাণ হারায়, তাহলে আমরা যুগ-খলীফাকে কী জবাব দেব যে, কয়েক লাখ টাকা খরচ হবে তাই আমরা এই ব্যবস্থা গ্রহণ করি নি।

রাওয়ালপিন্ডি শহরের অবস্থা খারাপ হবার পর যখন সেখানে মসজিদে জুমুআর নামায পড়ার অনুমতি পাওয়া যাচ্ছিল না তখন বিভিন্ন হালকায় জুমুআর নামায পড়ানো হত। এ বিষয়টি তিনি গভীরভাবে অনুভব করেন যে, জামা'তের সদস্যদের সাথে যোগাযোগ হচ্ছে না। জামা'তের সদস্যরা একস্থানে সমবেত হলে জামা'তের আমীর সাহেবের অবশ্যই নির্দেশনা দিতে, তাদেরকে পথ-দেখাতে এবং তাদের কথা কোনোর ও বোঝার সুযোগ ঘটে। কিন্তু (সরকারি নিষেধাজ্ঞার কারণে) সেখানে অফিসে বসারও অনুমতি ছিল না কোনো প্রতিটি জিনিষকে সীলগালা করে দেয়া হয়েছিল। কায়েদ খোদ্দামুল আহমদীয়া বলেন, অধমকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, এমন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন হালকায় যে জুমুআর নামায হয় তাকে যেন সেখানে নিয়ে যাই– যাতে লোকদের সাথে যোগাযোগ বহাল থাকে। কিন্তু আমি চেষ্টা করতাম তাঁকে যেন এমন কোনো স্থানে যেতে না হয় যেখানে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয় কেননা তার হাঁটুতে ব্যথা ছিল। কিন্তু একবার তিনি স্বয়ং মেরী রোডের বায়তুল হামদ-এ প্রোগ্রাম করার জন্য বলেন। তখন আমি নিবেদন করি, 'আমীর সাহেব সেখানে তো অনেক সিঁড়ি আছে সে কারণে আপনার অনেক কষ্ট হবে।' কিন্তু তিনি বলেন, 'না কিছু হবে না বন্ধুদের সাথে দীর্ঘদিন সাক্ষাৎ হচ্ছে না।'

(মরহুম ফযলুর রহমান সাহেব) কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদের খুবই সম্মান করতেন। এটিও সকল আমীরের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত, তারা যেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদের প্রতি যথাযথ সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। যদিও তাদের কোনো চাওয়া পাওয়া থাকে না আর কোনো কেন্দ্রীয় প্রতিনিধির হৃদয়ে এই বাসনা সৃষ্টি হওয়াও উচিত নয় যে, আমি সম্মান ও শ্রদ্ধা লাভ করবো। কিন্তু জামা'তের, জামা'তের সদস্যদের, জামা'তের কর্মকর্তাদের এবং আমীর প্রমুখদের এ বিষয়টি দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। তিনি (কায়েদ সাহেব) বলেন, একবার খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর সাহেব পিন্ডিতে এসেছিলেন তখন তিনি বলেন, আমি (আমীর সাহেবের সাথে) সাক্ষাৎ করতে চাই। সদর সাহেব বলেন, আমাকে সময় বলে দিন আমি নিজেই সেখানে পৌঁছে যাব। তখন আমীর সাহেব বলেন, আপনি আসবেন না, আপনি যেখানে আছেন সেখানেই থাকুন। আমি স্বয়ং আপনার সাথে সাক্ষাতের জন্য আসবো। এরপর যখন এখানে (লন্ডন) আসেন তখন রাওয়ালপিন্ডি জামা'তের জন্য খুবই চিন্তা করতেন। নিয়মিতভাবে কায়েদ সাহেবের সাথে যোগাযোগ রাখতেন এবং তাকে দিকনির্দেশনা দিতেন। *(আল্ ফযল পত্রিকা, ১ জানুয়ারি, ২০১৩)*

হুযূর আনোয়ার (আই.) জুমুআর নামাযের পর তাঁর জানাযার নামায পড়ান, এরপর একান্ত অনুগ্রহবশে প্রয়াতের কপালে হাত বুলিয়ে দেন এবং সালাম করে তাকে বিদায় জানান। পরেরদিন হুযূর প্রয়াতের পুরো পরিবারকে মোলাকাতের সুযোগ প্রদান করেন, দাফন-কাফনের বিস্তারিত খবরাখবর নেন এবং তাদেরকে বিভিন্ন উপদেশ দিয়ে বিদায় জানান। হযরত বেগম সাহেবা {হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর সহধর্মিণী} প্রয়াতের স্ত্রীকে আন্তরিক সমবেদনা জানান এবং প্রবোধ দেন। এরপর প্লেনযোগে প্রয়াতের মরদেহ পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডি এবং এরপর এ্যাম্বুলেন্সে করে রাবওয়ায় নিয়ে যাওয়া হয় আর বেহেশতী মাকবেরার দ্বারুল্ ফযল অংশে বুযূর্গানদের পাশে তাকে সমাহিত করা হয়।

*অনুবাদ: **মাওলানা আহমদ তারেক মুবাশ্বের***

(সূত্র: যুক্তরাজ্য থেকে প্রকাশিত আনসারুদ্দীন, মে-জুন, ২০২২ সংখ্যা)

Smile Aid
your complete dental healthcare
Oral & Dental Surgery
Dental Fillings
Root Canal Treatment
Dental Crowns, Bridges
Teeth Whitening
Dental Implant
Orthodontics (Braces)
In-House Dental X-RAY
Consultation Days :: Tuesday - Friday
For Appointment :: 01703 720 606
https://goo.gl/maps/UJX3RdaVzJ22
fb.me/DrSmileAid
Dr. Nazifa Tasnim
Chief Consultant
Oral & Dental Surgeon
BMDC Reg. No :: 4299
BDS (DU), PGT (BSMMU)
Specially Trained in Fixed Orthodontic Braces
Smile Aid
444, Kuwaiti Mosque Road
(Apollo Hospital-DhaliBari Link Road)
Shahid Muktijoddha Din Mohammad Dilu Bhaban
Adjacent to Basundhara R/A, Block A (Dhali Bari Pocket Gate)
Yatara, Dhaka - 1212
Consultation Days :: Saturday - Monday
For Appointment :: 01996 244 087
01778 642 471
Consultant
Holy-Lab Hospital & Diagnostic Center
KumarShil Mor, Brahmanbaria

বিবাহ সংবাদ

কেন্দ্রীয় রিশতানাতা দপ্তর, বাংলাদেশ

নবদম্পতির জন্য মহানবী (সা.)-এর দোয়া

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

"আল্লাহ্ তোমাকে আশিসের ভাগী করুন, তোমার প্রতি অঢেল আশিস বর্ষণ করুন আর তোমাদের উভয়কে পুণ্যকর্মে এক করে দিন" (আমীন)। *(আবু দাউদ, হাদীস নং: ২১৩০)*

- গত ০১/০৪/২০২২ কেয়া আক্তার, পিতা: মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ, মদনের পাড়া, ভবানীগঞ্জ, ফুলছড়ি, গাইবান্ধা-এর সাথে মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, পিতা: মোহাম্মদ জাহিরুল ইসলাম, পশ্চিম পাড়া, পানাতির পাড়া, বকশীগঞ্জ, জামালপুর-এর বিবাহ ৩,০০,০০০/= (তিন লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ২০২২-২৩/২৫

- গত ২১/১০/২০২২ মোবাশ্বেরা বেগম, পিতা: মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, কোড্ডা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-এর সাথে শেখ আহবাব হোসেন শামস, পিতা: মোহাম্মদ মঞ্জুর হোসেন, ৪১১/১ কান্দিপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-এর বিবাহ ৩,০০,০০১/= (তিন লক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ২০২২-২৩/২৮

- গত ২১/০৫/২০২২ নিশি বেগম, পিতা: মরহুম আতাউর রহমান চৌধুরী, জামালপুর, শাকের মোহাম্মদ, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ-এর সাথে মোহাম্মদ জনাইদ, পিতা: জুয়েল মিয়া, তারুয়া, আশুগঞ্জ ব্রাহ্মণবাড়িয়া-এর বিবাহ ৪,০০,০০০/= (চার লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ২০২২-২৩/২৬

- গত ০৫/১০/২০২২ শান্তা জান্নাত সাথী, পিতা: সোবহান মিয়া, বন্দভাট পাড়া, আহমদনগর, ঝিনাইগাতী, শেরপুর-এর সাথে মোহাম্মদ রমজান আলী, পিতা: মোহাম্মদ হারুন মিয়া, গোয়াল গাঁও, পানতিয়া পাড়া, বকশীগঞ্জ-এর বিবাহ ১,৫০,০০০/= (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। **বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ২০২২-২৩/২৯**

- গত ১৪/০৭/২০২২ খাদিজা আক্তার, পিতা: মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, মধ্য ধানগড়া, গাইবান্ধা-এর সাথে মোহাম্মদ সবুজ মিয়া, পিতা: মোহাম্মদ শফিক মিয়া, দেওয়ান টুলী, মাহিগঞ্জ, রংপুর-এর বিবাহ ১,৩৫,০০০/= (একলক্ষ পয়ত্রিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ২০২২-২৩/২৭

- গত ১০/১১/২০২২ আমাতুশ শাফি প্রিয়, পিতা: মরহুম মোহাম্মদ দুলাল মিয়া, ঘাটুরা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-এর সাথে শান্ত মিয়া, পিতা: মোহাম্মদ জসিম মিয়া, করনি, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল-এর বিবাহ ৫,০০,০০১/= (পাঁচ লক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ২০২২-২৩/৩০

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

হিফ্‌যুল কুরআন একাডেমী, বাংলাদেশ

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের সর্বস্তরের সদস্যগণের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, হিফ্‌যুল কুরআন একাডেমী, বাংলাদেশের ৩-৪ বছর মেয়াদী কোর্সের ২য় ব্যাচে ভর্তির জন্য সকল স্থানীয় জামা'ত হতে আগ্রহী ও মেধাবী প্রার্থীদের **আগামী ২৫ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখের** মধ্যে ন্যাশনাল আমীর, আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, ৪ নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১, বাংলাদেশ বরাবর আবেদনপত্র আহ্বান করা যাচ্ছে।

ইনসান আলী ফকির
সেক্রেটারী, হিফ্‌যুল কুরআন একাডেমী, বাংলাদেশ।

আবশ্যকতা:

১। আবেদনকারীকে অবশ্যই ৫ম শ্রেণি পাশ অথবা সমমানের (বি গ্রেড) হতে হবে।
২। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে।
৩। নাযেরা কুরআন জানতে হবে।
৪। আবেদনকারীকে অবশ্যই আবেদনপত্রটি স্থানীয় আমীর/প্রেসিডেন্ট সাহেবের স্বাক্ষরসহ কেন্দ্রে প্রেরণ করতে হবে।

আগামী ২৮ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখের মধ্যে ইন্টারভিউ-এর জন্য ডাকা হবে

অনলাইনেও আবেদনপত্র জমা করানো যাবে:

E-mail: na.amjb1913@gmail.com, insanaliamjb@gmail.com
Whatsapp No.: +88 0171 6973377

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম

জীবন উৎসর্গকারী (ওয়াকফে যিন্দেগী)-এর অঙ্গীকার পত্র

আমি আমার সম্পূর্ণ জীবনকে স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নিঃশর্তভাবে উৎসর্গ করছি।

১. আমি আমার জন্য প্রস্তাবিত যে কোনো ধরনের দায়-দায়িত্ব বিনা পারিশ্রমিকে প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী পালন করব।

২. আমি কথায় বা কাজে জামা'তী নেযাম বা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোনো আচরণ করব না বরং সব সময় কেন্দ্র-প্রদত্ত যাবতীয় নির্দেশনা মেনে চলব। অনুরূপভাবে, আমি আহ্‌মদীয়া জামা'তের অধীনে পরিচালিত ওয়াক্‌ফ (জীবন উৎসর্গ) ব্যবস্থার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করব এবং বাহ্যিক অর্থে ও অন্তর্নিহিত অর্থে এর অনুসরণ করব।

৩. আহ্‌মদীয়া জামা'তের পক্ষ থেকে আমার ও আমার পরিবারের ভরণপোষণের জন্য যদি কোনো সম্মানী ভাতা অনুমোদ করা হয় সেক্ষেত্রে আমি সেটাকে আমার প্রাপ্য অধিকার বলে গণ্য করব না বরং সেটাকে পুরস্কার মনে করে গ্রহণ করব।

৪. আমার শিক্ষা প্রশিক্ষণের (তথা তা'লীম ও তরবিয়তের) জন্য যে সিদ্ধান্তই গৃহীত হবে আমি তা পূর্ণরূপে পালন করব।

৫. আমার জন্য বাহ্যত: তুচ্ছ থেকে তুচ্ছতর যে কাজই নির্ধারণ করা হোক আমি তা পালনে অস্বীকৃতি জানাব না বরং হাসিমুখে ও পূর্ণোদ্যমে তা সম্পাদন করব।

৬. কখনও আমার বিরুদ্ধে শাস্তি নির্ধারণ হলে নির্দ্বিধায় কোনো ওজর-আপত্তি না তুলে আমি তা মাথা পেতে বরণ করে নিব।

৭. বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা বাইরে যেখানেই আমাকে আহ্‌মদীয়া জামা'তের পক্ষ থেকে নিয়োগ প্রদান করা হবে, আমি সানন্দে নির্দেশনা অনুযায়ী সেই দায়িত্ব পালন করব।

৮. কখনও আমাকে কোনো কারণে ওয়াক্‌ফ থেকে বহিস্কার করা হলে এতে আমার আপত্তি করার কিছুই থাকবে না। কিন্তু আমার প্রতি অর্পিত কর্তব্য পালন করা থেকে স্বেচ্ছায় অব্যাহতি লাভের কোনো অধিকার আমার থাকবে না।

৯. আমি আর্থিক কুরবানী, প্রাণ বিসর্জনের কুরবানী, মান-সম্মানের কুরবানী অথবা আবেগ-অনুভূতির কুরবানীসহ সব ধরনের কুরবানী বা ত্যাগ স্বীকারে সর্বদা প্রস্তুত থাকব।

১০. যাঁর অধীনেই আমাকে কাজ করতে বলা হবে আমি তাঁর পূর্ণ আনুগত্য করব।

১১. আমি ওয়াক্‌ফে যিন্দেগীর অঙ্গীকারপত্র জীবন উৎসর্গীকরণের যাবতীয় শর্তাবলী খুব ভাল করে বুঝে-শুনে এবং এগুলো পালনের দৃঢ় প্রত্যয় সহকারে পূরণ করছি।

নাম:.....

পূর্ণ ঠিকানা:.....

..... স্বাক্ষর.....

পিতার নাম:..... স্বাক্ষর.....

মাতার নাম:..... স্বাক্ষর.....

ওয়াক্‌ফে নও নম্বর (ক্ষেত্র বিশেষে প্রযোজ্য):.....

ফোন নম্বর:.....

জাতীয় পরিচয় পত্রের নম্বর (যদি থাকে):.....

তারিখ:

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, মাদারটেকে মহান সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা উদ্‌যাপন

Lorem ipsum

New Vol. No. 85 | 12th Issue

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

31st December, 2022 ❑ Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

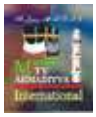

MTA-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

mta INTERNATIONAL
এমটিএ দেখুন অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

MTA-তে খুতবা প্রচারের সময়সূচি

(১) **শুক্রবার:** বাংলাদেশ সময় **সন্ধ্যা ৭:০০ সরাসরি সম্প্রচার।** পুনঃপ্রচার **রাত ১০:২০** এবং **ভোর ৪:০০।**

(২) **শনিবার:** পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় **সকাল ৮:১০** এবং **বিকাল ৫:০০।**

(৩) **রবিবার:** পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় **সন্ধ্যা ৭:০০।**

(৪) **বৃহঃবার:** একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় **রাত ৮:০০।**

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান এবং প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর পঞ্চম খলীফা
হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)-এর কতিপয় বক্তৃতা ও পত্রের সংকলন-এ

"বিশ্ব সংকট ও শান্তির পথ"

পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ (ইংরেজি পঞ্চম সংস্করণের অনুবাদ) আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ প্রকাশ করেছে।

পুস্তকটির অনুবাদের কাজটি করেছেন প্রফেসর আব্দুল্লাহ শামস বিন তারিক। প্রথম সংস্করণের অংশে আরো যাদের উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল তা প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় বর্ণিত আছে। বইটির অনুবাদ, কম্পোজ, সম্পাদনা, প্রুফ-রিডিং, মুদ্রণ প্রভৃতি কাজে সম্পৃক্তদের আল্লাহ্ তা'লা উত্তম পুরস্কার দান করুন। নিজ নিজ কপি সংগ্রহের জন্য কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

50% OF SMALL BUSINESSES AREN'T USING SOCIAL MEDIA PROPERLY TO PROMOTE THEIR BUSINESS.

TO KEEP AHEAD OF THE CURVE, YOU NEED -

* DIGITAL MARKETING STRATEGY
* PROMOTIONAL VIDEO
* FACEBOOK PROMOTION
* PRODUCT PHOTOGRAPHY
* PRODUCT VIDEOGRAPHY

STUDIO ENTERTAINMENT REIMAGINED
JUNCTION

Find us on
STUDIOJUNCTIONBD

Dental Care

ডাঃ মোঃ সাদিউল রাফি
বি. ডি. এস (ঢাকা),
পিজিটি (ওরাল এন্ড ম্যাক্সিলোফেসিয়াল সার্জারী)
শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
বিএমডিসি রেজিঃ নং-৪৬৩৩, **মোবাঃ ০১৯২০-১৫৯১৯৭**

ওরাল এন্ড ডেন্টাল সার্জন

চেম্বার ঃ
ডাঃ রাফি ওরো-ডেন্টাল সার্জারী
১২৫৭, বাগানবাড়ী মোড় (পানির পাম্প সংলগ্ন),
পূর্ব জুরাইন, ঢাকা-১২০৪

সাক্ষাতের সময়:
বিকাল ৫টা - রাত ৯টা (মঙ্গল - শুক্রবার)

সিরিয়ালের জন্য: ০১৭১০-৭৭৬৮৬৫

আমজাদ খান চৌধুরী নার্সিং কলেজে
২০২১-২০২২ শিক্ষাবর্ষে
২য় ব্যাচের
ভর্তি কার্যক্রম
শুরু হয়েছে

ভর্তি ইচ্ছুক শিক্ষার্থীরা চলে আসুন আমজাদ খান চৌধুরী নার্সিং কলেজে এবং নার্সিং শিক্ষার জন্য উপযোগী আধুনিক পরিবেশের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করুন

HOTLINE
01769 696210
01704 155888
01704 155999

সুযোগ-সুবিধা:
- নার্সিং কলেজের নিকটে নিজস্ব আধুনিক হাসপাতাল রয়েছে, যেখানে খুব সহজেই প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসের প্রশিক্ষণ নেয়ার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে।
- ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসিক ব্যবস্থানের মনোরম পরিবেশ রয়েছে।
- সুবিশাল সাতটি আলাদা আলাদা ল্যাব ও অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক রয়েছেন।
- সুবিশাল লাইব্রেরি ও আলাদা পড়ালেখার মনোরম পরিবেশ।
- উন্মুক্ত স্থান, খেলার মাঠ, নামাজের স্থান, খাবারের ব্যবস্থা, অডিও ভিজ্যুয়াল কক্ষ এবং হল রুমের ব্যবস্থা রয়েছে।

টাঙ্গুর, দীরগঞ্জ, নাটোর
akc.nursingcollege@gmail.com
www.akcnc.edu.bd /groups/akcnc/

Printed and Published by **Ahmadiyya Art Press,** 4 Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211
on be half of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Sheikh Mostafizur Rahman**
Phone: +880-2-57300808, 57300849, Fax: +880-2-57300880, E-mail: pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
www.theahmadi.org (Pakkhik Ahmadi web site live now)